নবীনচন্দ্র সেনের

পলাশির যুদ্ধ

অধ্যাপক এ. এল. ব্যানার্জি. এম. এ.

সম্পাদিত

মডার্ণ বুক এজেন্সী

কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

পলাশির যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যও বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। নবীনচন্দ্র নিঃসন্দেহে পরিবর্তন-যুগের একজন বড় কবি। তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ' এক সময়ে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল—এমন লোকপ্রিয় কাব্য সেই সময়ে আর কেহ রচনা করেন নাই। ইহার প্রবল কবিত্ব এবং রচনার নূতন ভঙ্গি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল—এই কাব্যের দ্বারাই তিনি সাধারণের মধ্যে কবি-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বাঙালির হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনে ক্ষুদ্রায়তন এই কাব্যখানির প্রভাব বড় কম ছিল না। এ-বিষয়ে বাঙালি তাঁহার নিকট চির-ঋণী।

দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি ,পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের প্রায় শতবর্ষের মধ্যে ইহার একটিও শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা ১৯১১ সালে প্রকাশিত হিতবাদী সংস্করণের সহিত পাঠ মিলাইয়া বাঙালির প্রিয় এই কাব্যখানির একটি নূতন সংস্করণ বাহির করিলাম। মূল কাব্য, কাব্যসম্পর্কে বিস্তৃত ও রসগ্রাহী আলোচনা, কবির জীবনী—এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য। আশা করি, কাব্যামোদী পাঠকগণের নিকট ইহা সমাদৃত হইবে।

সুসাহিত্যিক শ্রীমণি বাগচি এই পুস্তকখানির সম্পাদনায় আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইতি—আষাঢ়, ১৩৬০।

— উৎসর্গ —

দয়ার সাগর,

পূজ্যতম

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

দেব !

যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আবার আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল। আপনার আশীর্ব্বাদে, ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন, হৃদয় প্রসন্ন আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনার দয়াসাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতা-দাবানল হইতে যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল ;—এই কারণ তাহার এত আনন্দ। বঙ্গকবিরত্নগণ স্বীয় মানস-উদ্যানজাত যে চিরসুবাসিত কুসুমরাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি সেরূপ পবিত্র পরিমলবিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব ? আমার হৃদয়—কানন ; আমার উপহার—বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অর্চ্চনা করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। আমার এই মাত্র সাহস—এই মাত্র ভরসা।

১লা মাঘ সন ১২৮২	আপনার চিরানুগত শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

কাব্য-পাঠ

" 'পলাশির যুদ্ধ' যে বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।...যে বাঙ্গালী হইয়া, বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালীজন্ম বৃথা।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

"বাঙ্গালীর মধ্যে নবীনচন্দ্র প্রথম গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছেন এবং 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য লিখিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিষচক্ষে পড়িয়া জীবনে অনেক দুর্গতি ভোগ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের নিকট বাঙ্গালী চিরঋণী থাকিবে।"

—গিরিশচন্দ্র

পলাশির যুদ্ধ

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

পলাশির যুদ্ধ

প্রথম সর্গ

মুরসিদাবাদ—জগৎশেঠের মন্ত্রভবন।

১

দ্বিতীয়-প্রহর নিশি, নীরব অবনী ;
নিবিড়-জলদাবৃত গগন-মণ্ডল ;
বিদারি আকাশতল,—যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলি চঞ্চল।
দেখিতে বঙ্গের দশা সুর-বালাগণ,
গগন-গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া,
অমনি সিরাজ-ভয়ে করিতে বন্ধন
চমকিছে রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিয়া।
মুহূর্ত্তেক হাসাইয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
সভয়ে চপলা মেঘে পশিছে তখন।

২

যবনের অত্যাচার করি দরশন,
বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত,
ভয়েতে নক্ষত্র-বালা লুকায়ে বদন,
নীরবে ভাবিছে মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত।

প্রজার রোদন, রাজ-আমোদের ধ্বনি,
করিয়াছে যামিনীর বধির শ্রবণ ;
গগন পরশে পাছে ভাসায়ে ধরণী,
এই ভয়ে ঘনঘটা গর্জ্জে ঘন ঘন।
গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দে কাঁপিছে অবনী,
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে যামিনী।

৩

নীরদ-নির্ম্মিত নীল চন্দ্রাতপতলে,
দাঁড়াইয়া তরুরাজি, স্থির, অবিচল,—
প্রস্তরে নির্ম্মিত যেন ! জাহ্নবীর জলে,
একটী হিল্লোল নাহি করে টলমল।
না বহে সময় স্রোত ; জাহ্নবীর জল ;
প্রকৃতি অচলভাবে আছে দাঁড়াইয়া ;
অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল
শুনিছে, কি মেঘমন্দ্র ঘন গরজিয়া,
বিজ্ঞাপিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর,
কাঁপাইয়া অত্যাচারী পাপীর অন্তর।

৪

ভয়ানক অন্ধকারে ব্যাপ্ত দিগন্তর,
তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।
বিনাশিয়া যেন এই বিশ্বচরাচর,
অবিষাদে অন্ধকার বিরাজে কেবল।
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি হয় দরশন ;—
সমাধি করিয়া যেন বদন-ব্যাদান,
নির্গত করেছে শব বিকট-দশন,
বারেক খুলিলে নেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ !

ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান,
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ-কৃপাণ।

৫

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী,
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন ;
নীরবে কাঁদিছে আহা ! বঙ্গবিষাদিনী,
নীহার-নয়নজলে তিতিছে বসন।
নীরব ঝিল্লির রব ; স্তব্ধ সমীরণ ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতী শয্যায়,
পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়,
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয়।

৬

যেই মুরসিদাবাদ সমস্ত শর্ব্বরী
শোভিত আলোকে, যথা শারদ গগন
খচিত নক্ষত্র-হারে ; রজনী সুন্দরী
হাসিত কুসুমদামে রঞ্জিয়া নয়ন ;
উথলিত অনিবার আমোদ লহরী ;
ভাসিত নগরবাসী, অমর-সমান,
শান্তির-সাগরে সুখে ; সে মহানগরী,
ভাবনা-সাগরে কেন আজি ভাসমান ?
যাহার সঙ্গীত-স্বরে জাহ্নবী-জীবন
নাচিতে উল্লাসে, আজি সে কেন এমন ?

৭

কল্পনে !
চঞ্চল চপলালোকে চল এক বার,
যাই সুরপুরী-সম শেঠের ভবনে,
ভারতে বিখ্যাত যেন কুবের-ভাণ্ডার ;
অচলা কমলা যথা হীরক-আসনে।
যথায় সঙ্গীত-স্রোত বহে অনিবার
কামিনী-কোমলকণ্ঠে, জিনিয়া সুস্বরে
কোকিল-কাকলী, কিংবা সুতার সেতার,
বরষি অমৃতধারা শ্রবণ-বিবরে।
অন্ধকারে সাবধানে শঙ্কিত অন্তরে,
চল যাই কি আমোদ দেখি সেই ঘরে।

৮

একি ! !
নীরব সেতার, বীণা, মধুর বাঁশরী !
পাখোয়াজ, মেঘনাদে গর্জ্জে না গভীর !
নৈশ-নীরদের মালা আবাহন করি,
কেহ নাহি গায় মেঘমল্লার গম্ভীর !
নিষ্কোষিত-অসি করে দৌবারিকদল,
অন্ধকারে দ্বারে দ্বারে করিছে ভ্রমণ ;
একটী কপাট কোথা নাহি অনর্গল,
একটী প্রদীপ কোথা জ্বলে না এখন।
তিমিরে অদৃশ্য গৃহ, প্রাচীর, প্রাঙ্গণ ;
বোধ হয় ঠিক্ যেন বিরল বিজন।

৯

কেবল কতটী রশ্মি গবাক্ষ বিদারি,
একটী মন্দির হ'তে হইয়া নির্গত,

তমোরাশি মাঝে ক্ষীণ আলোক বিস্তারি
শোভিছে, আকাশ-চ্যুত নক্ষত্রের মত।
যেই ক্ষুদ্র পথে রশ্মি হয়েছে নিঃসৃত,
কল্পনে! সে পথে পশি নিভৃত আলয়ে,
কহ, সর্ব্বপুরী যবে তিমিরে আবৃত,
এই কক্ষে আলো কেন জ্বলে এ সময়ে?
গভীর নিশীথে কি গো বসি কোন জন,
অভীপ্সিত মহামন্ত্র করিছে সাধন?

১০

কি আশ্চর্য্য!
বঙ্গের অদৃষ্ট ন্যস্ত যাঁহাদের করে,
উজ্জ্বল বঙ্গের মুখ যাঁদের গৌরবে,
তাঁরা কেন আজি এত বিষণ্ণ অন্তরে,
নিশীথে নিভৃত স্থানে বসিয়া নীরবে?
সহস্রে বেষ্টিত হয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে
বসেন সতত যাঁরা, তাঁরা কেন, হায়!
নির্জ্জনে, মলিন মুখে, বিষাদিত মনে,
বসিয়া গম্ভীর ভাবে মজিয়া চিন্তায়?
প্রাচীরে চিত্রিত পটে নৃমুণ্ডমালিনী,
লোল-জিহ্বা অট্টহাসি ভৈরব-ভামিনী।

১১

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন;
বহে কি না বহে শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল,
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।

অনিমেষ-নেত্রে, কষ্টে, যেন একমনে
পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে ; কিংবা চিত সনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্‌ঘাটন,
বঙ্গ ভবিষ্যৎ-সিন্ধু করে সন্তরণ।

১২

একটী রমণীমূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিণী, দীর্ঘ-গ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,—
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে,
শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়নযুগল,
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময় ;
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ-গরিমা-গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয় !
বিশ্বব্যাপী সেই দয়া, জাহ্নবী যেমন,
সমস্ত বঙ্গেতে করে সুধা বরিষণ।

১৩

সুস্নিগ্ধ নয়নে, ওই গম্ভীর বদনে,
করতলে বামগণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিছে জানকী যেন অশোক কাননে
আপন উদ্ধার-চিন্তা, বিষাদিত মন।
আবার এ দিকে দেখ, স্বতন্ত্র আসনে
নীরবে বসিয়া এক তেজস্বী যবন,
দুরূহ ভাবনা যেন ভাবিতেছে মনে,
শ্বেত শ্মশ্রুরাশি দীর্ঘ চুম্বিছে চরণ।

ক্ষণে চাহে শূন্য পানে, ক্ষণে ধরাতল,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে শ্মশ্রু করে দলমল !

১৪

দেশদেশান্তর হ'তে ইঁহারা সকল,
সমবেত কেন এই নিভৃত মন্দিরে ?
বঙ্গের যে ক'টী তারা নির্ম্মল, উজ্জ্বল,
কি ভাবনা-মেঘে সব ঢেকেছে অচিরে ?
সৈরিন্ধ্রীস্বরূপা বঙ্গে, পাপ-কামনায়
করেছে কি অপমান কীচক-যবন !
কেমনে উচিত দণ্ড দিবেন তাহায়,
তাই কি মন্ত্রণা করে ভ্রাতা পঞ্চজন ?
অথবা রাজ্যের তরে বিষাদিত মনে,
ভাবিছে কি কৃষ্ণা সহ বসি তপোবনে ?

১৫

কোন্ ব্রতে ব্রতী আজি কে বলিবে হায় ?
কি বর মাগিছে সবে শ্যামার চরণে,
সামান্য লোকের মন কহা নাহি যায়,
রাজাদের কি কামনা বলিব কেমনে ?
ওই দেখ—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি তুলিয়া বদন,
কষ্টের স্বপন যেন, হলো অপসৃত,
সঙ্গীদের মুখপানে করি নিরীক্ষণ,
কহিতে লাগিলা মন্ত্রী নিজ মনোনীত।
পর্ব্বতনির্ঝর হ'তে অবরুদ্ধ নীর,
বহিতে লাগিল যেন, গরজি গম্ভীর।

১৬

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র !
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
আমা হ'তে এই কর্ম্ম হবে না সাধন।
আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
কৃতঘ্নতা-অসি—ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন—
কেমনে ধরিব আহা ! বিপক্ষে তাহার ?
যেই তরুছায়াতলে জুড়াই জীবন,
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার ?
অথবা নিষ্ঠুর মনে, ভুজঙ্গ যেমন,
কোন্ প্রাণে যে গাভীর করি স্তন্যপান,
দুগ্ধ বিনিময়ে তারে করি বিষ দান ?

১৭

"কৃতঘ্নতা মহাপাপ ! বল না আমায়
যেই করে করে মুখে আহার প্রদান,
কোন্ মূর্খ সেই কর কাটিবারে চায় ?
কৃতঘ্নহৃদয় আহা ! নরক সমান !
সামান্য যে উপকারী, তার অপকার
করিলে, পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত ;
একে রাজদ্রোহী, তাহে মন্ত্রী হয়ে তার,
কেমনে কুমন্ত্রে তার করিব অহিত ?
একে রাজ-বিদ্রোহিতা ! তাহে অনিশ্চিত
এই পাপ পরিণাম—হিত, বিপরীত !

১৮

"সিংহাসন-চ্যুত করি অভাগা নবাবে,
কোন্ অভিসন্ধি বল হইবে সাধন ?

লইবে যে রাজদণ্ড আপন প্রভাবে,
যমদণ্ড করিলে কে করিবে বারণ ?
নাদেরসাহার মত যদি কোন জন,
দিল্লী বিনাশিয়া আসে বঙ্গে বীরভরে,
কেমনে রাখিবে ধন, বাঁচাবে জীবন,
কে বল বাঁধিয়া বুক দাঁড়াবে সমরে,
হরিয়া সর্ব্বস্ব যদি প্রদানে কেবল
বিনিময়ে ভিক্ষাপাত্র, দাসত্ব-শৃঙ্খল ?

১৯

"সহজে দুর্ব্বল মোরা চির-পরাধীন
পঞ্চ শত বৎসরের দাসত্ব-জীবন
করিয়াছে বঙ্গদেশ শৌর্য-বীর্য্য-হীন,
রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত এখন।
শাসিতে বাঙ্গালা-রাজ্য আপনার বলে
পার যদি, নবাবেরে করিতে দমন,
সাজ তবে রণসাজে ;—কি কাজ কৌশলে
নতুবা অধীন থাক এখন যেমন।
রাজপদে, মন্ত্রিপদে, আছি বিরাজিত,
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত।

২০

"সিরাজ দুর্দ্দান্ত অতি, নিষ্ঠুর পামর,
মানি আমি। কিন্তু লোকে বনের শার্দ্দূল
পোষে না কি, পোষে না কি কালবিষধর,
বুদ্ধির কৌশলে ?—তবে কেন হেন ভুল ?
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, পুণ্য-পাপ-ভয়
সবে মিলি কর যদি হৃদয়ে সঞ্চার,

এই যে দুর্দ্দমনীয় দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
হইবে কোমল যেন কুসুমের হার।
শীতল সৌরভরূপে শান্তির বিধান
হইবে সমস্ত বঙ্গে, স্বর্গের সমান।

২১

"নাহি কাজ অতএব পাপ-মন্ত্রণায়;
কি কাজ পাপেতে আত্মা করি কলুষিত!
মজিয়া মোহের ছলে, মাতি দুরাশায়,
কি জানি ঘটাব পাছে হিতে বিপরীত॥"
এইরূপে ভবিষ্যৎ কহি মন্ত্রিবর
নীরবিলা। মুহূর্ত্তেক নীরব সকল।
নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,
প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।
অমনি জগৎশেঠ তুলিয়া বদন,
বলিতে লাগিলা দর্পে সজীব বচন।

২২

"মন্ত্রিবর!
সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির-পরাধীন?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে?
স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে এক-মত;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহস দুর্জ্জয়!
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।
যে দিন মামুদ ঘোরি আসে সিন্ধুপার,
সেই দিন হ'তে দেখ দৃষ্টান্ত অপার।

২৩

"কি আশ্চর্য্য মন্ত্রীর যে এই অভিপ্রায়
হবে আজি, এই ভাব হবে অকস্মাৎ!
একটী কণ্টক কভু ফুটেনি যে পায়ে,
সে কেন না হাসিবেক দেখি শেলাঘাত?
বিদরে হৃদয় যার সে করে রোদন।
যেখানে অস্ত্রের লেখা ব্যথাও তথায়।
ফলতঃ মন্ত্রীর এই বঙ্গ-সিংহাসন,
এই সব মন্ত্রণায় তাঁহার কি দায়?
যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন,
পরের কেবলমাত্র লৌকিক রোদন।

২৪

"কি বলিব মন্ত্রিবর! বিদরে হৃদয়
বলিতে সে সব কথা। তপ্তলৌহ-সম
ধমনীতে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।
প্রতি কেশরন্ধ্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-নির্গম
হয় বিদ্যুতের বেগে। কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম, ভূভারত যুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা-সঞ্চার।

২৫

"শেঠের বংশের হায়! ঐশ্বর্য্যের কথা
সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত।
জগৎশেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা

লক্ষমুদ্রা-সমকক্ষ। জাহ্নবীর মত
শতমুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদরাশি সমুদ্র-ভাণ্ডারে।
আপনি নবাব যিনি, (অন্য কোন্ ছার!)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।
কিন্তু অপমানে হায়! ফেটে যায় বুক,
সে জগৎশেঠ আজ অবনত মুখ!

২৬

"কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম,—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌলার যদি হয় অনুকূল,
অথবা মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয়দান যদি দেবকুল,
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালী
সিরাজদ্দৌলার রক্তে ধুইব নিশ্চয়।
যা থাকে কপালে, আর যা করেন কালী,
কঠিন পাষাণে দেখ বেঁধেছি হৃদয়।
সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা,
অসম্ভব, হ'বে লুপ্ত শেঠের গরিমা।

২৭

"যেই প্রতিহিংসা-অগ্নি—ভীম দাবানল—
জ্বলিছে হৃদয়ে মম, প্রতিজ্ঞা আমার
সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিত তরল
নিবাইবে সে অনল। কি বলিব আর,
সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্রমণ্ডল,

সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল !
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।

২৮

"বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার,
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
আমি এ কলঙ্ক-ডালি লইয়া মাথায়,
দেখাব না মুখ পুনঃ সজাতি-সমাজে ;
সঁপেছি জীবন মম এই প্রতিজ্ঞায়,
কথায় যা বলিলাম দেখাইব কাযে।
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাই আর !"

২৯

নীরবিলা শেঠ-শ্রেষ্ঠ। অরুণ-লোচনে
হতেছিল যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত।
অধর রক্তাক্তপ্রায় দশন-দংশনে ;
মুষ্টিবদ্ধ করদ্বয়। "স্বপনের মত"—
বলিলেন রাজা রাজবল্লভ তখন,
"বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত ;
নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন।
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাসক্ত এত !
এই অল্প দিনে, দেহ হয় রোমাঞ্চিত,
কি পাপে না বঙ্গভূমি হ'লো কলুষিত।

৩০

"ক্রমে পাপলিপ্সা-স্রোত হ'তেছে বিস্তার !
এই দুর্নিবার নদী, কে বলিতে পারে,
কোথা হবে পরিণত ? কিছুদিন আর,
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না,—থাকিবে না কুলশীলমান
বঙ্গবাসীদের হায় ! এখনো সবার
অনিশ্চিত ভয়ে, ত্রাসে, কণ্ঠাগত প্রাণ।
সীমা হ'তে সীমান্তরে এই বাঙ্গালার,
উঠিতেছে হাহাকার, ভাবে প্রজাগণ
কেমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন।

৩১

"যে যন্ত্রণা দুরাচার দিতেছে আমায়
জানেন সকলে, আমি কি বলিব আর ?
যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে হায় !
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার।
প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার
হইয়াছে দেশান্তর ; ইংরেজ বণিক
আশ্রয় না দিত যদি, কি দশা আমার
হ'তো এত দিনে ! মম, প্রাণের অধিক
পত্নীপুত্র-বিরহেতে হয়েছি এখন,
নিদাঘে পল্লব-শূন্য তরুর মতন।

৩২

"কলিকাতা-জয়-কালে—কাঁপে কলেবর
অন্ধকূপ-অত্যাচার করিলে স্মরণ ;
কেশরাশি কণ্টকিত হয় শিরোপর,

শঙ্কিত শজারুপৃষ্ঠ-কণ্টক যেমন!—
কলিকাতা-জয়-কালে, যদিও পামর
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,
যে দিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সে দিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ।
বিপদে বেষ্টিত ব'লে মনে বড় ভয়,
আপাততঃ তাই প্রাণ রেখেছে নির্দ্দয়।

৩৩

"এই ত কলির সন্ধ্যা; প্রগাঢ় তিমিরে
এখনো বঙ্গের মুখ হয়নি আবৃত।
এখনো রয়েছে আলো আশার মন্দিরে,
নয়ন না পালটিতে হবে অন্তর্হিত।
এই রজনীতে যথা ঘন জলধরে
অবিচ্ছিন্ন ব্যাপিয়াছে গগনমণ্ডল;
এইরূপে চিন্তা-মেঘ, ভীম বেশ ধ'রে,
ঢাকিবে সমস্ত বঙ্গ। দৌরাত্ম্য কেবল
গভীর জলদনাদে করিবে গর্জ্জন;—
কার সাধ্য সেই ঝড় করিবে বারণ?

৩৪

"এই কালে এত বিষ!—পূর্ণকলেবর
হ'বে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হ'বে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর।
নাশিবে নিশ্বাসে কত মানব-জীবন!
সকালে সকালে যদি না কর বিনাশ,
কিংবা বিষদন্ত নাহি কর উৎপাটন,

কিছু পরে কার সাধ্য সহিবে, নিশ্বাস
বঙ্গসিংহাসন হ'তে ঘুচাবে বেষ্টন ?
নিমীলিত নেত্রে থাকা আর শ্রেয়ঃ নয়
সিংহাসনচ্যুত হবে কিসে দুরাশয়,

৩৫

"চিন্ত সদুপায়। মম এই অভিপ্রায় —
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
(কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয় !)
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার। তা হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে ;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি-সুধাময় !"
নীরবিলা নৃপমণি, উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

৩৬

আরম্ভিলা কৃষ্ণচন্দ্র, 'ধরণী-ঈশ্বর',
সম্বোধিয়া ধীরে রাজনগর-ঈশ্বরে
সসম্ভ্রমে,—"যা কহিলা সত্য, নৃপবর !
কার সাধ্য অণুমাত্র অস্বীকার করে ?
যে করে সে অতি মূঢ় ! ভেবে দেখ মনে
শার্দ্দূল-কবল-গত, কিংবা নাগপাশে
বদ্ধ যেই জন হায় ! ভীষণ বেষ্টনে,
নিরাপদ, বসি যেন আপনার বাসে,
ভাবে সে যদ্যপি মনে, তবে এ সংসারে
ততোধিক মূর্খ আর বলিব কাহারে ?

৩৭

"একে ত অদূরদর্শী নৃশংস যুবক,
আজন্ম বর্দ্ধিত পাপে। হিংসা অহঙ্কার
অলঙ্কার তার! তাহে পথপ্রদর্শক
হয়েছে ইতরমনা যত কুলাঙ্গার,
নীচাশয়। ইহাদের পরামর্শে, হায়!
ফলিছে বঙ্গের ভাগ্যে যে বিষম ফল,
বলিতে বিদরে বুক; যথায় তথায়
হাহাকার-ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল।
নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ,
সুন্দর বাঙ্গালা-রাজ্য হয়েছে শ্মশান।

৩৮

"সেই দিন মহারাষ্ট্র বিপ্লবে বিশেষ
এ দেশ উপর্য্যুপরি হয়েছে প্লাবিত।
যথা এই দস্যুদল করেছে প্রবেশ
ভীম রোষে, দাবানলরূপে আচম্বিত,
অগ্নিতে, অসিতে, অপহরণে সে দেশ
হইয়াছে মরুভূমি। সত্রাসে কৃষক
বিষাদে বিজন বনে করেছে প্রবেশ
না ডরি শার্দ্দূলে, সিংহে; কুরঙ্গ-শাবক
অদূরে শুনিয়া ব্যাধ-বন-নিপীড়ন,
সভয়ে যেমতি পশে নিবিড় কানন।

৩৯

"ইহাদের দুরবস্থা করিতে মোচন,
কি যত্ন না করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব

বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দ্দি, সমরে শমন,
শিবিরে অপক্ষপাতি অমায়িক ভাব !
জীবনের অবসান, তথাপি উজ্জ্বল
ছিল ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নির মতন ;
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জ্বল !
ছিল যেই সিংহাসনে, ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ এতাদৃশ শূর,
এখন বসেছে এক ঘৃণিত কুক্কুর !

৪০

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর বিচিত্র সভায় !
কামিনী-কোমল-কোল রত্নসিংহাসন !
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন !
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে ; শুনেছি শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে !
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল ; নৃপতি-সদন
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন !

৪১

"কিন্তু কি করিবে সখে ! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গপ্রতি। বলিতে না পারি
লিখেছেন বিধি হায় ! কত যে কি দুঃখ
কপালে তাহার—চির-অভাগিনী নারী !
সেনাকুল-কুলাঙ্গার, গৌড়-অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরকের ডরে,

কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে !
সেই দিন হ'তে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল
প'ড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্যসুত-বল

৪২

"আর কি পারিবে তাহা করিতে খণ্ডন ?
জানেন ভবিতব্যতা ! কিংবা এ শৃঙ্খল
জেতৃভেদে কতবার হইবে নূতন
কে বলিবে ! কে বলিতে পারে রণস্থল
পাণিপথে কতবার হবে পরীক্ষিত
ভারত-অদৃষ্ট হায় ! গিয়াছে পাঠান ;
গতপ্রায় মোগলেরা ; কিন্তু শৃঙ্খলিত
আছে এক ভাবে যত ভারত-সন্তান
সার্দ্ধ পঞ্চশত-বর্ষ ! না জানি কখন
ভারত-দাসত্ব বিধি করিবে মোচন !

৪৩

"কিন্তু কি করিবে, হায় ! জিজ্ঞাসি আবার
কি করিবে ? সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,
বরিলাম পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার,
বুঝিতে না পারি পাপ-আশার ছলনা !
কিন্তু পরিণামে হায় লভিনু কি ফল ?
সুরামত্ত, কামাসক্ত, পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চমিথুন দুর্ব্বল
ব্যাধকবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে।
নবাবের ঘোর কোপে পড়িয়া সকলে
না জানি পাইনু রক্ষা কোন্ পুণ্যফলে।

৪৪

"কিন্তু তাহা ভাবি মনে, এ শর-শয্যায়
কেমনে থাকিব বল ? দিবস যামিনী
থাকি সশঙ্কিত, ধন-প্রাণ-আশঙ্কায় ;
দুঃখে দিবা, অনিদ্রায় কাটি নিশীথিনী ।
ভূত-ভয়ে ভীত জন ঘোর অন্ধকারে
স্বীয় পদ-শব্দে যথা হয় সন্ত্রাসিত,
আমরা তেমন মৃদু পবনসঞ্চারে
ভাবি শমনের ডাক, হই রোমাঞ্চিত !
অগ্নিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতুগৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার ?

৪৫

"অতএব ইংরেজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্যচ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে—
যবন-কুলের গ্লানি !—মম অভিপ্রায়,
বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে সিংহাসনোপরে ।
অন্ধকূপ-অত্যাচার প্রতিবিধানিতে
এসেছে বৃটিশ-সিংহ—বীর-অবতার
উদ্ধারিয়া কলিকাতা পশি হুগ্লীতে
দ্রুত-ইরম্মদ-বেগে ; সৈন্য-পারাবার
নবাবের বিনাশিয়া ভাতিল অম্বরে
শিশির ভেদিয়া সূর্য্য হুগ্লীর সমরে ।

৪৬

"অসম সাহসে পশি, অভয় হৃদয়ে
বিলোড়িয়া নবাবের সৈন্যের সাগর,

তুলেছিল যেই ঝড়, দন্তে তৃণ লয়ে
সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যজিল সমর।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ ফরাশি ইংরাজ
মিলিল আহবে ঘোর ; গঙ্গা-তীরে, নীরে,
জ্বলিল সমরানল ধরি ভীম সাজ ;
ভয়ে ভীতা ভাগীরথী বহিলেন ধীরে।
নবম দিবস পরে নভঃ আলো ক'রে,
উঠিল বৃটিশ-ধ্বজা চন্দননগরে।

৪৭

" 'ফরাশির সম যোদ্ধা নাহি ভূ-ভারতে'
বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত সকলে।
সে ফরাশি-যশোরবি সেই দিন হ'তে
ক্লাইবের কটাক্ষেতে গেছে অস্তাচলে।
বিশেষ তাহার সনে বঙ্গ-সেনাপতি,
স্বীয় সৈন্য যদি যুদ্ধে করেন মিলন,
—প্রভঞ্জনসহ সিন্ধু দুর্নিবার গতি,—
পাবক-সহায় হ'বে প্রবল পবন।
মুহূর্ত্তে ক্লাইব যুদ্ধে হ'লে সম্মুখীন,
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অর্ব্বাচীন।"

৪৮

এ যুক্তিতে সমবেত সভ্য যত জন,
কিছু তর্ক পরে, সবে হ'লেন সম্মত।
বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফিরায়ে নয়ন,—
"জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত ?"
যবনিকা-অন্তরালে চিত্রার্পিত প্রায়,
বসিয়া রমণীমূর্ত্তি ; অস্পন্দ-শরীর ;

নাহি বহিতেছে যেন ধমনী-শাখায়
রক্তস্রোত ; শূন্য দৃষ্টি, দুনয়ন স্থির।
এইরূপে বঙ্গমাতা বসি শূন্যমনে,
'রাণীর কি মত ?' প্রশ্ন শুনিলা স্বপনে।

৪৯

'রাণীর কি মত ?' শুনি সুপ্তোত্থিতা প্রায়,
বলিতে লাগিলা রাণী ভবানী তখন,—
"আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় !
শুনিতে বাসনা যদি, বলিব এখন।
যেই কাল রঙ্গে সবে চিত্রিলে নবাবে,
জানি আমি এই চিত্র অতি ভয়ঙ্কর ;
যতই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে
কর চিত্র, ততোধিক পাপাত্মা পামর।
রে বিধাতঃ ! কোন্ জন্মে করেছি কি পাপ ?
কোন্ দোষে সহে বঙ্গ এত মনস্তাপ ?

৫০

"সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল-হৃদয়,
নৃপবর ! কি বলিব ? কিন্তু—এ চক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয়।
কেন মহারাজ এত হইলেন ভ্রান্ত ?
কাপুরুষ-যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায় একবাক্যে সব,
বুঝিতে না পারি আমি ; না বুঝিনু হায় !
ভবাদৃশ বীরগণ,—বীরবংশোদ্ভব—
কেমনে হ'লেন হীন মন্ত্রে উত্তেজিত,
আমি যে অবলা নারী, আমার ঘৃণিত।

৫১

"লক্ষ্মণসেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ! তবে জানিলে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে? ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী,—
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে না পারি।
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্বস্থাপন।

৫২

"মহারাজ! একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিকে কর দরশন!
মোগল-গৌরব-রবি, আরঙ্গজিব সনে
অস্তমিত; নহে দূর দিল্লীর পতন।
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাশি-বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইবের করে।
বঙ্গদেশে এই দশা—বৃটিশ-কেতন
উড়িছে ফরাশি দুর্গে হাসিয়া অম্বরে।
ক্ষুব্ধসিংহ প্রতিদ্বন্দ্বী যূথপতি-বরে
আক্রমিবে কোন মতে, বসিয়া বিবরে।

৫৩

"চিন্তে মনে মনে যথা, ক্লাইব তেমতি
আক্রমিতে বঙ্গেশ্বরে ভাবিছে সুযোগ।
তাহাতে তোমরা যদি সহ সেনাপতি

বর তাঁরে, তবে তাঁর প্রতাপ অমোঘ
হইবে অপ্রতিহত। যে ভীম অনল
জ্বলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মত
পোড়াবে নবাবে ; মিরজাফরের বল
কি সাধ্য নিবাবে তারে ? হবে পরিণত
দাবানলে ; না পারিবে এই ভীমানল,
সমস্ত জাহ্নবীজল করিতে শীতল।

৫৭

"বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা ; সমস্ত ভারতে
বৃটিশের তেজোরাশি, বল, অতঃপর
কে পারিবে নিবারিতে ? কে পারে জগতে
নিবারিতে সিন্ধুচ্ছ্বাস, ঝঞ্চা ভয়ঙ্কর
আছে মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিক্রমে যাহার
মোগল-সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত,
দস্যুব্যবসায়ী তারা, হবে ছারখার
বৃটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত
সম্মুখ সমরে। যেই শশী তারাগণে
জিনি শোভে, হততেজ ভানুর কিরণে !

৫৫

"যেইরূপে যবনেরা ক্রমে হতবল
হইতেছে দিন দিন, অদৃশ্যে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত-অদৃষ্ট যন্ত্রে, দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত ?
দাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্ট্র-পতি
হ'তেছে বিক্রমশালী, কিছু দিন আর,

মহারাষ্ট্র-পতি হবে ভারত-ভূপতি !
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত-উদ্ধার ।
সার্দ্ধপঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে ।

৫৬

"বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজ-বিপ্লব দুর্ব্বার ।
নাহি কাজ অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোধীন, দেখি বিধি বিধাতার
সিংহাসনচ্যুত করি বঙ্গ-ভূপতিরে,
জ্বালাইয়া বঙ্গে ঘোর বিপ্লব-অনল,
হায় ! এইরূপে খড়্গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্তবলে, লভিবে কি ফল ?
ঘুচিবে কি অত্যাচার, বল নৃপবর !
অধীনতা অত্যাচার নিত্য সহচর ।

৫৭

"জ্ঞানহীন নারী আমি, তবু মহারাজ !
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায় ।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে ; হয়ে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দ্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর ।
হ'বে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে
কি ভীষণ ! ভেবে মম শরীর শিহরে ।

৫৮

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।

৫৯

"বিশেষ তাদের এই পতন-সময় ;
কি পাতশাহ, কি নবাব, আমাদের করে
পুতুলের মত ; খুঁজে খোঁজ নাহি হয়,
কে কোথায় ভাসিতেছে আমোদ-সাগরে।
আমাদের করে রাজ্য-শাসনের ভার !
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজমন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয় ;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।

৬০

"অন্য তরে—ইংরাজেরা নব্য পরিচিত ;
ইহাদের-রীতি নীতি আচার বিচার
অণুমাত্র নাহি জানি। না জানি নিশ্চিত

কোথায় বসতি, দূর সমুদ্রের পার।
আমাদের সঙ্গে দেখ ভাবিয়া অন্তরে
কিবা ধর্ম্মে, কিবা বর্ণে, আকারে, আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য। বাণিজ্যের তরে
আসিয়া ভারতে এবে রাজ্যের বিস্তার
করিতেছে চারি দিকে ; দুর্দ্দান্ত প্রভাবে
কাঁপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গায় নবাবে।

৬১

"বৃদ্ধ আলিবর্দ্দির সে ভবিষ্যদ্‌বাণী
ভুলেছ কি মহারাজ ? যদি কোন জন
ইংরাজের তেজোরাশি করিবারে গ্লানি
যোগাত মন্ত্রণা, বৃদ্ধ বলিত তখন—
'স্থলে জ্বলিয়াছে যেই সমর-অনল
না পারি নিবা'তে আমি : তাহাতে আবার
প্রজ্বলিত হয় যদি সমুদ্রের জল,
কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নিস্তার ?'
এই সংস্কার তাঁর ছিল চিরদিন,
অচিরে ভারত হবে বৃটিশ-অধীন।

৬২

"বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়,
এতই প্রভাব যার, ভেবে দেখ মনে,
নবাব অবর্ত্তমানে এই বাঙ্গালায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে ?
মেঘাবৃত রবি যদি এত তপ্ত, হায় !
মেঘমুক্ত হবে কিবা তেজস্বী বিপুল !
স্বাধীনতা-আশালতা, মুকুলিত প্রায়
ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্ম্মূল

প্রভাবে তাহার ; নাহি জানি অতঃপর
উঠিবে কি মহাঝড়,—এ কি ভয়ঙ্কর !”

৬৩

কড় কড় মহাশব্দে বিদারি গগন,
জিনি শত সিংহনাদ, সহস্র কামান,
অদূরে পড়িল বজ্র, ধাঁধিয়া নয়ন।
গরজিল ঘন, ধরা হ'ল কম্পমান।
সেই ভীম মন্দ্র, রাণী ভবানীর কাণে
প্রবেশিল ; বলিলেন—“এ কি ভয়ঙ্কর !
ওই শুন, মহারাজ ! বসিয়া বিমানে
শিরোপরে স্বরীশ্বর দেব পুরন্দর
কহিছেন ও কি কথা অভ্রান্ত ভাষায় !
দেখি কি অনল-লেখা আকাশের গায় !

৬৪

“অতএব মহারাজ ! এই মন্ত্রণায়
নাহি কাজ ; ষড়যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন।
শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়
অনল-শিখায় পশে কোন্ মূঢ় জন ?
‘রাণীর কি মত ?’—শুন আমার কি মত ;—
ইন্দ্রিয়-লালসা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত,
(আহা ! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায় !)
নিশ্চয় প্রকৃত রোগ হয়েছে নির্ণয়,
কিন্তু এ ব্যবস্থা মম মনোমত নয়।

৬৫

“আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,

সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে ; যেন পূর্ণ শশী,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসি-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।

৬৬

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে,
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য, শেঠবর !
বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার !"

৬৭

আবার ভীষণ নাদে অশনি-পতন ;
আবার জীমূতবৃন্দ গর্জ্জিল ঘর্ঘরে ;
বহিল ভীষণ-বেগে ভীম প্রভঞ্জন ;
দূর হ'তে হুঙ্কারিয়া মহাক্রোধ-ভরে
বারিধারা রণক্ষেত্রে করিল প্রবেশ ,
উঠিল তুমুল ঝড় ঝট্‌কায় ঝট্‌কায়

কাঁপাইয়া অট্টালিকা তরু-নির্ব্বিশেষ,
রণাহত মহীরুহ উপাড়ি ধরায়।
ছুটিল বিদ্যুৎ-বেগে ঝলসি নয়ন,
আলোকিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রকৃতি ভীষণ।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

কাটোয়া—বৃটিশ-শিবির।

১

দিবা অবসান প্রায়; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি, সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে, বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী
চুম্বি মৃদু কলকলে মন্দ সমীরণ,
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

অদূরে কাটোয়া-দুর্গে বৃটিশ-কেতন
উড়িছে গৌরবে, উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার,—অস্ত্র ঝলঝলে;
দূর হ'তে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে।
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

৩

বৃটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চালন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্ ;
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে ;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ, কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব, 'বিপুল' ঝঙ্কার,
বিজ্ঞাপিছে বৃটিশের বীর্য্য অহঙ্কার।

৪

নীরবে—সৈন্যের স্রোত বহিছে নীরবে
অতিক্রমি ভাগীরথী ; বিরাজে বদনে
গম্ভীরতা-প্রতিমূর্ত্তি। আসন্ন আহবে
বিমল চিন্তার স্রোত উচ্ছ্বাসিছে মনে
হতভাগাদের, আহা ! প্রতিবিম্ব তার
ভাসিছে নয়নে, ওই ভাসিছে বদনে !
পারিতাম যদি আমি চিত্রিতে সবার
বদনমণ্ডল, তবে মানবের মনে
যত সুকুমার ভাব হয় উদ্দীপিত,
এই চিত্রে মূর্ত্তিমান্ হ'ত বিরাজিত।

৫

কোন হতভাগা আহা ! বসিয়া বিরলে
প্রেমের প্রতিমা পত্নী স্মরিয়া অন্তরে

নীরবে ভাসিছে দুই নয়নের জলে ;
ভাসে ভারাক্রান্তচিত্ত বিষাদ-সাগরে
ভুলেছে সমরসজ্জা, না দেখে নয়নে
শিবির,—সৈনিক,—সেনা,—নদী ভাগীরথী ;
রণবাদ্য ঘনরোল না পশে শ্রবণে ;
প্রেমমন্ত্র-মুগ্ধ-চিত, প্রেম-মুগ্ধ-মতি ।
কেবল দেখিছে প্রিয়া-বদন-চন্দ্রিমা,
কেবল শুনিছে প্রেম-ভাষা-মধুরিমা !

৬

কোথায় বা বিদায়ের হৃদয়বেদনা
স্মরিয়া মরমে, আহা ! চিত্রি স্মৃতিবলে
অশ্রুসিক্ত প্রণয়িনী-বদনচন্দ্রমা,
বিকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে ;—
নেত্রনীলোৎপল হ'তে প্রেমে উচ্ছ্বসিয়া
ঝরেছিল যেইরূপে অশ্রুমুক্তাবলী,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
বরষে শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি ;
বেণীমুক্ত কেশরাশি ; অলক্ত অধর,
সতত সরস, পূর্ণ অমৃতশীকর ;—

৭

কাঁদে কোন হতভাগা । ভাবে নিরন্তর,
আর কি সে চারু মুখ দেখিবে নয়নে ?
আর কি সে প্রেমময়ী-কোমল-অধর
চুম্বিবে প্রণয়-উষ্ণ সুদীর্ঘ চুম্বনে ?
আসন্ন সমরক্ষেত্রে, নশ্বর সময়ে,
প্রহারিবে যবে অরি অসি উগ্রতর,—

দেখিবে সে মুখচন্দ্র। মধ্যাহ্ন-ভাস্করে
জিনি, তোপ-বিনিঃসৃত গোলা ভয়ঙ্কর
আসিবে হুঙ্কারি যবে দেখিয়া তখন
সে মুখ সজলশশী, ত্যজিবে জীবন।

৮

আবার কোথায় কাঁদে বিকল অন্তরে
অভাগা জনক, স্মরি অপত্য-মমতা।
আর কি লইবে কোলে, চুম্বিবে আদরে,
সুবর্ণকুসুম পুত্র, কন্যা স্বর্ণলতা?
কেহ বা ভাবিয়া বৃদ্ধ জনক জননী
কাঁদিছে নীরবে দুঃখে, আনায় মাঝার
কুরঙ্গশাবক কাঁদে নীরবে যেমনি,
ভাবি অবিলম্বে হবে ব্যাধের আহার।
এইরূপে মনোভাব কুসুম-কোমল,
গঙ্গাতীরে, নীরে, ফুটে ঝরে অবিরল!

৯

শ্বেতদ্বীপ-সুত কেহ ভাবিয়া স্বদেশ—
বীরত্বের রঙ্গভূমি, ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার,
স্বাধীনতা-চিরবাস, গৌরবে দিনেশ,
সভ্যতার সুশিক্ষার উন্নতি-আধার,—
হায় রে পূর্ব্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে!
অধীর স্মৃতির অস্ত্রে; ভাবে মনে মনে,
দেখিবে সে জন্মভূমি আর কত দিনে!
দেখিবে কি পুনঃ আহা! এ মর জীবনে?
শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভাবি শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া,
অধীর বিচ্ছেদ-বাণে, ফাটে বীর হিয়া!

১০

কেহ বা ভাবিছে এই আসন্ন সমরে
কীর্ত্তির কিরীট-রত্ন লভিবে অচিরে ;
কেহ ভাবে পদোন্নতি ; কেহ অর্থতরে,
আকাশ করিছে পূর্ণ সুবর্ণ মন্দিরে।
কেহ বা কল্পনা-বলে বধিয়া নবাবে,
বিজয়-পতাকা তুলি পশি কোষাগারে
লুটিতেছে ধনজাল ; কল্পনা-প্রভাবে
লুণ্ঠন করিয়া শেষ, ষোড়শোপচারে
পূজিতেছে প্রণয়িনী কোন বীরবর,
সুবর্ণে সৃজিয়া হর্ম্ম্য অতি মনোহর।

১১

ধন্য আশা কুহকিনি ! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন !
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি ; হায় ! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে ;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র, নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস !

১২

ধন্য, আশা কুহকিনি ! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি !
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায় !

মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি !
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার,
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায় ! অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।

১৩

ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি !—কঙ্কাল-শরীর ;
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার ;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপিত ; রুগ্ন কলেবর ;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কাণে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

১৪

ধর্ম্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্ম্মচারী,
উদরে জঠর-জ্বালা, গুরু কার্য্যভারে
অবনত মুখ,—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, প্রভু-পদাঘাত-ভয়ে।
যথা শালবৃক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে

যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়,
নীল সিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে।
ঘর্ম্মসহ অশ্রুবিন্দু বহে দর দর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর!

১৫

না জানি কি ভবিষ্যৎ, আশা মায়াবিনী!
চিত্রিলে নয়নে তার; মুছি ঘর্ম্মজল,
মুছি অশ্রুজল, পুনঃ লইয়া লেখনী,
আরম্ভিল মসীযুদ্ধ হইয়া সবল।
নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,
নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভঙ্গ-প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন।
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা,
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি—"না ছাড়িব আশা।"

১৬

যথা যবে বহে বেগে ভীম প্রভঞ্জন,
সামান্য সরসীনীর হয় হিল্লোলিত;
আসন্ন আহবে ক্ষুদ্র পদাতিক মন
করেছে তেমতি হায় আজি উচ্ছ্বসিত!
কিংবা সৌরকর যথা মুকুটরতন
রচি ইন্দ্রচাপে, রঞ্জে নীল কাদম্বিনী;
তেমতি সৈন্যের ম্লান বিষাদিত মন
ছলে দুরাকাঙ্ক্ষা, চিত্রে আশা মায়াবিনী।
হয় যদি ইহাদের দুরাশা পূরণ,
কত পর্ণগৃহ হবে রাজার ভবন।

১৭

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি !
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি ?
বঙ্গ ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি !
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বল কুহকিনি !
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত ?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

১৮

কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ ? কিংবা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে ! তোমার মায়ায় ;
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়।
অতএব দয়া করি, কহ, দয়াবতি !
কি চিত্রে রঞ্জিছ আছি শ্বেত-সেনাপতি ?

১৯

শিবির অনতিদূরে বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায়।

গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু বদনমণ্ডলে
নাহি সুরূপের চিহ্ন ; মনোহারিতায়
নাহি রঞ্জে শ্বেত কান্তি ; অথচ যুবার
সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময়। প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার।
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট,—
প্রশস্ত সুদৃঢ় ; বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস, স্রোতঃ ভয়ঙ্কর।

২০

যুগল নয়ন জিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময় ; অন্তর্ভেদি তীব্র দৃষ্টি তার
স্থির, অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।
যে অসম সাহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার
জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল,
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার—
ভুবনবিজয়ী জ্যোতিঃ—বরষে গরল
শত্রুর হৃদয়ে ; কিন্তু কখন আবার,
সে নেত্রনীলিমা, নীল নরকাগ্নি মত,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত।

২১

নীরবে, নির্জ্জনে, বীর বসি তরুতলে ;—
অর্থহীন ঊর্দ্ধদৃষ্টি। বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগন দৃষ্টি কল্পনার বলে
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে দূর ভবিষ্যৎ
নিরখিতে। নিরখিতে,—যেই দুরাচার

দুরন্ত যুবক ছিল দুষ্প্রবৃত্তি-রত,
নির্ভয় হৃদয় সদা, পিতা মাতা যার
পাঠাল ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের তরে,
অথবা মরিতে দূরে মান্দ্রাজের জ্বরে,—

২২

নিরখিতে অদৃষ্টে সে অভাগা যুবার
আর কি লিখেছে বিধি ; করিবে দর্শন
'অদৃষ্টচক্রের কত আবর্ত্তন আর।
মধ্যাহ্ন-রবির জ্যোতিঃ করিয়া হরণ,
জ্বলিতেছে দুনয়ন ; তাহে রূপান্তর
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ আরক্ত এখন
বৃটিশ-সুলভ-রাগে ; মুহূর্ত্তেক পর,
করিল বিষাদে যেন ঘন আচ্ছাদন।
কভু ক্রোধে বিস্ফারিত, চিন্তায় কুঞ্চিত,
কখন করুণ রসে হতেছে আদ্রিত।

২৩

নীরবে ভাবিছে বীর,—"হায় উপেক্ষিয়া
সমগ্র সমর-সভা, নিষেধ সবার,
অণুমাত্র ভবিষ্যৎ মনে না ভাবিয়া,
দিলাম একাকী রণ-সমুদ্রে সাঁতার।
যদি ডুবি, একা নহি, ডুবিবে সকল
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত ;
ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য, যাবে রসাতল ;
বৃটিশ-গৌরব-রবি হবে অন্তর্হিত।
যদি ভীম ভূকম্পনে ভাঙ্গে শৃঙ্গবর,
পড়ে তরু গুল্ম হর্ম্ম্য সহিত শিখর ;

২৪

"একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন্ মতে? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ ফণা আস্ফালিয়া।
যেই মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছি তারে
যদি সে জানিতে পারে, ক্রোধে গরজিয়া
একই নিশ্বাসে পাপী নাশিবে সবারে।
নর-রক্তে সন্ধিপত্র হবে প্রক্ষালিত,
অন্ধকূপ-হত্যা পুনঃ হবে অভিনীত।

২৫

"যদি প্রতারণা মিরজাফরের মনে
থাকে,—এখনও নাহি চিহ্ন মাত্র তার—
যদি এই সন্ধি মিরজাফরের সনে
হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার;
সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি,
পশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে
তবেই ত বিপদের না রবে অবধি,
পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে।
এই স্বল্প সেনা লয়ে কি হইবে তবে
ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে?

২৬

"শুধু পরাজয় নহে; তাহার কারণ
নাহি ভাবি, নাহি ডরি কালের কবল;—
লভিয়াছি যবে এই মানব-জীবন,

মৃত্যু ত আমার পক্ষে নিয়তি কেবল !
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গালার স্বর্ণ-প্রসূ বাণিজ্যের আশা
ডুবিবে অতল জলে ; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা ।
শত্রুশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পতিত দেখিয়া,
দক্ষিণে ফরাশি-সিংহ উঠিবে গর্জিয়া ।

২৭

"কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হবে ভাবিয়া এবে ? কে কবে ভাবিয়া
আজি জানিয়াছে, কালি কি হবে ঘটন ?
যা আছে অদৃষ্টে আর দেখি পরীক্ষিয়া ।
দুইবার যমদণ্ড হানি শিরোপরে
নিজ হস্তে না মরিনু ; না মরিনু হায় !
অব্যর্থ-সন্ধানী সেই সৈনিকের করে
মরিতে কি অবশেষে,—বুক ফেটে যায় !—
নরাধম কাপুরুষ যবনের করে ?
মরিলেও এই দুঃখ থাকিবে অন্তরে ।

২৮

"সেই দিন প্রভঞ্জন-পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে ;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া
পশিনু বিদ্যুৎবেগে দুর্গের ভিতরে
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে ;—কুরঙ্গ যেমতি

যূথমধ্যে ক্রুদ্ধ সিংহ করি দরশন ;—
মুহূর্ত্তেকে হইলাম দুর্গ-অধিপতি !
সেই দিন বজ্র নাহি পড়িল মাথায় ;
শত্রুর কৃপাণ নাহি পশিল গলায় ।

২৯

"কিংবা পঞ্চাশৎ দিন আক্রমণ পরে,
—স্মরিলে সে কথা, রক্তে বিদ্যুৎ খেলায়—
হোসেনের মৃত্যুদিন উপলক্ষ করে,
উন্মত্ত যবন-সৈন্য করিয়া সহায়,
পশিল কর্ণাটরাজ, নিশীথ সমরে ।
পঞ্চশত সৈন্যে, দশসহস্র সেনায়
বিমুখিনু সেই দিন, তুলিনু বিমানে
বৃটিশের সিংহনাদ কাঁপায়ে 'রাজায়' ;
মরিতে কি এই ভীরু নবাবের করে ?
না—তা নয় ! আছে মম এই হস্তোপরে

৩০

"অন্ধকূপহত্যা প্রতিবিধানের ভার ;
রক্ষিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ-গৌরব
দণ্ডিয়া নবাবে । হেন উদ্দেশ্য যাহার
তার কাছে কি অসাধ্য কিবা অসম্ভব ?
অবশ্য পশিব রণে, জিনিব সমর ;
অবশ্য সিরাজদ্দৌলা পাবে প্রতিফল ;
'হও অগ্রসর, রণে হও অগ্রসর'—
আমার অন্তর-আত্মা কহিছে কেবল ।
না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি, আমি ইঙ্গিতে তাহার

৩১

"চলিতেছি ইচ্ছাহীন পুতুলের প্রায়।"—
বলিতে বলিতে বীর, ত্যজিয়া আসন,
ভ্রমিতে লাগিলা দ্রুত. নিরখি ধরায় ;
ভূতল ভেদিয়া যেন যুগল নয়ন
গিয়াছে কোথায়, ধরা দেখা নাহি যায়।
কল্পনা-তাড়িত পক্ষে মানস চঞ্চল,
অতিক্রমি নীল সিন্ধু লহরীমালায়,
বিরাজে ইংলণ্ডে কভু ; ভাবী রণস্থল-
চিত্রে কভু ; সেই চিত্রে হৃদয়ে তাঁহার,
কত আশা, কত ভয়, হ'তেছে সঞ্চার।

৩২

চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে ;
অকস্মাৎ চারিদিকে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি ; বাজিল গগনে
কোমল-কুসুম-বাদ্য,—সঙ্গীত তরল,
সহস্র ভাস্কর তেজে গগন-প্রাঙ্গণ
ভাতিল উপরে ; নিম্নে হাসিল ভূতল ;
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন।
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতিবিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

৩৩

যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব রাগে অলক্ত অধর,

রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর।
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত উজ্জ্বল বসনে,
খেলিছে বিজলী, বস্ত্র অমল ধবলে ;
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে
ঝলসে নক্ষত্ররাজি বসন-অঞ্চলে।
বেশ ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মত,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

৩৪

অর্দ্ধ-অনাবৃত পীন পূর্ণ পয়োধর ;
তুষাস উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর,—
চিরপ্রসন্নতাময়. প্রীতিপারাবার !
নহে উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,
—কিংবা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে—
স্বর্গীয় শারদ শশী সে মুখ-সুষমা ;
বিশ্ববিমোহিনী আহা ! অতুলিতা ভবে !
বসন্তরূপিণী ধনী ; নিশ্বাস মলয় ;
কোকিল কোমল কণ্ঠ ; নেত্র কুবলয়।

৩৫

কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন সেই বরাননে ;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা ব'সে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে
কনক অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,

অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত।
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম-সৌরভ,
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব।

৩৬

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চিরপ্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ, জিনি মধ্যাহ্ন-তপন ;
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা ;
যেমন প্রখর তেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃতমাখা পূর্ণ মধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী-মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে !

৩৭

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—"কি ভয় বাছনি ?"—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন-পবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠধ্বনী
শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান ;
অচল হইল রবি অস্তাচল-শিরে,
মুহূর্ত্ত করিতে সেই স্বরসুধা পান।
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের, বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে ; বাজিল অমনি

৩৮

শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্রে,—"কি ভয় বাছনি ?
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,
লক্ষ্মীকুললক্ষ্মী আমি, শুন বীরমণি।
রাজলক্ষ্মী মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী
বিধাতার ; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চিরগৌরবিণী। ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে ; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোতঃ ; চিন্তি অনিবার
ইংলণ্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি, বিস্তার।

৩৯

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন,
আসিনু পৃথিবীতলে তোমারে, বাছনি !
শুনাইতে ভবিষ্যৎ বিধির লিখন ;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি !
এই হ'তে ইংলণ্ডের উন্নতি নিয়তি ;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর।
মধ্যাহ্ন-গৌরবে যবে বৃটন-ভূপতি
উজলিবে দশ দিক্, দেশ দেশান্তর,
তাঁর ছত্র ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।

৪০

"সোণার ভারতবর্ষে, বহু দিন আর
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাশি দুর্জ্জয়
করিবে না রক্তপাত ; দ্বিতীয় বাবর,

ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়,
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন।
কিংবা অতিক্রমি দূর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন,
ভীম বেগে দস্যুস্রোতঃ আসিবে না আর।
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব্ব অধ্যায়।

৪১

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছু দিন পরে
যেই মহাশক্তি, বাছা, করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লীর ঈশ্বরে।
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র-সিংহ পশিবে বিবরে।
যেমতি প্রভাতরবি ভেদিয়া তুষার
যতই উঠিতে থাকে গগন উপরে
ততই পাদপছায়া হয় খর্ব্বাকার;
তেমতি এ শক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাশি তত হবে হতবল।

৪২

"তুমি সে শক্তির মূল, আদি অবতার।
হইও না চমৎকৃত, ভেবো না বিস্ময়;
ভারত অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত; যেই দিকে তব ইচ্ছা হয়
ঘুরিবে ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামত।
বঙ্গে যেই ভিত্তি তুমি করিবে স্থাপন,

সময়েতে তদুপরি ব্যাপিয়া ভারত
অটল অচল রাজ্য ছাইবে গগন।
বিধির মন্দির হ'তে আনিয়াছি আমি
ভারতবর্ষের ভাবী মানচিত্রখানি।

৪৩

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ ঊর্দ্ধ শিরে পরশে গগন;—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেণিল সাগর,
ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মি তদুপরে,—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে।
অচল পর্ব্বত শ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে।

৪৪

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব্ব সীমানায়;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে;
বিংশতি বৃটন নাহি হবে সমতুল।
তথাপি হইবে—আর নাহি বহু দিন,
অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র বৃটন-অধীন।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায়?

৪৫

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথীতীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী,
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটীরে,
শোভিবে, অমরাবতীরূপে করি গ্লানি,
রাজ-হর্ম্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে, আলোকমালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা-শিরে
বৃটিশ-পতাকা, যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবনসনে অতি ধীরে ধীরে ;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে বৃটিশরাজ্য করিবে স্থাপন।

৪৬

"নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে ;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায়।
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত।
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য রাজা হবে আনত উন্নত ;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে।
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
'ইংলণ্ডের প্রতিনিধি—ভারত-ঈশ্বর।'

৪৭

"শতেক বৎসর রাজবিপ্লবের পরে
ইংলণ্ডের সিংহাসন হইবে অচল ;

উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল।
কঙ্কালবিশিষ্ট পূর্ব্ব নৃপতি সকল
ঘুরিবে বেষ্টিয়া সৌর উপগ্রহ মত ;
আশু রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্দ্দান্ত মোগল,
ছায়া কিংবা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত।
বিক্রমে শার্দ্দূল মেষ, অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান একই নির্ঝরে।

৪৮

"ধর, বৎস ! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্য নিদর্শন !
যত দিন পূর্ব্ব রাজ্যে বৃটিশ-শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
তত দিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহারাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয় ;
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার অসি রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে বিধাতার করে।

৪৯

"যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী,
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে,
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন।

ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে
উদিবে নিদাঘতেজে বৃটিশ তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়।

৫০

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস, অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান ন্যায়।
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে;
সমভাবে, সর্ব্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে,
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল;
সম্মুখে ভীষণ, বৎস, গণনার স্থল।"

৫১

অদৃশ্য হইলা বামা; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব-কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের; গেল স্বর্গ এল ধরাতল।
হায়! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে সলিল-ভিতরে
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি, নিরখিয়া মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল;
অন্তর-নয়নে বীর বৃটনন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিলা তেমন।

৫২

ভাঙ্গিল বিস্ময়-স্বপ্ন ; মেলিলা নয়ন ।
নাহি সে আলোকরাশি, নাহি বিদ্যমান
আলোকমণ্ডিত সেই রমণীরতন,—
নির্ম্মল আলোকে শ্বেতভুজা অধিষ্ঠান !
স্বর্গীয় সৌরভ আর না বহে পবনে,
স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধা না হয় বর্ষণ,
আর সেই মানচিত্র না দেখে নয়নে,
মুষ্টিবদ্ধ করে আর নাহি সে দর্পণ ।
থাকে না তা নর করে, থাকিলে কি আর
স্বার্থের সমরক্ষেত্র হইত সংসার ?

৫৩

"সেনাপতি ভাগীরথী-তীর অতিক্রমি,
আজ্ঞা অপেক্ষায় সৈন্য আছে দাঁড়াইয়া,
বেলা অবসানপ্রায়, অস্ত দিনমণি —"
বলিল জনৈক সৈন্য । চমকি উঠিয়া
ছুটিলা ক্লাইব বেগে, নাহি কিছু জ্ঞান
কোথায় পড়েছে পদ, শূন্যে কি ধরায়
মানসিক শক্তিচয় যেন তিরোধান
হয়েছে রমণীসনে ; দৈববাণী প্রায়
এখনো গম্ভীরে কর্ণে বাজিছে কেবল,—
"সম্মুখে ভীষণ, বৎস ! গণনার স্থল !"

৫৪

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল,

স্থির ভাগীরথী-জল করি উচ্ছ্বসিত,
অমনি বৃটিশ বাদ্য বাজিয়া উঠিল।
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙ্গিল গড়িল!
একতানে বীরকণ্ঠ বৃটিশ-তনয়
গায়—"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

গীত

১

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখে 'বৃটনিয়া আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী বৃটিশজননী।
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জ্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
বৃটনের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে বৃটনচরণ।
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

২

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি
অভয়ে আমরা বৃটননন্দন,

আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশদেশান্তরে করি বিচরণ।
নব আবিষ্কৃত আমেরিকাদেশে,
কিংবা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায় ?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয় !"

৩

সম্পদ সাহস ; সঙ্গী তরবার ;
সমুদ্র বাহন ; নক্ষত্র কাণ্ডারী ;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার ;
শয্যা রণক্ষেত্র, ঈশা ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানল সম বিক্রম বিস্তার ;
আছে কোন্ দুর্গ, কোন্ অদ্রিপতি,
কোন্ নদ, নদী, ভীম পারাবার
শুনিয়া সভয় কম্পিত না হয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয় ?"

৪

আকাশের তলে এমন কি আছে
ডরে যারে বীর বৃটিশতনয় ?
কেবল বৃটিশললনার কাছে,
সেই বীরহৃদয় মানে পরাজয়।
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে
স্মরিয়া অন্তরে, চল রণে তবে ;

হায় কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শু'নে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে
গাবে বামাকণ্ঠস্বর করি লয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

৫

দাও তবে সবে অভয় অন্তরে,
বারি বিদারিয়া দাও দাঁড়ে টান,
বৃটনিয়াপুত্র রণে নাহি ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান।
বৃটিশের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়।
কি ছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়।
গাবে বঙ্গ সিন্ধু, গাবে হিমালয়,—
"জয় জয় জয় বৃটিশের জয়!"

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

পলাশি ক্ষেত্র

১

এই কি পলাশি ক্ষেত্র ? এই সে প্রাঙ্গন ?
যেই খানে,—কি বলিব ?—বলিব কেমনে !
অদৃষ্টের সেই ক্রীড়া, মহা আবর্ত্তন
মানবের এক ক্ষুদ্র কর পরশনে !
ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে ;—
যেইখানে মোগলের মুকুটরতন
খসিয়া পড়িল আহা ! পলাশির রণে ?
যেই খানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?
দুর্ব্বল বাঙ্গালি আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র, তবে, হে কল্পনে !

২

অতিক্রমি সান্ত্রীদল, যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিলগঞ্জিনী
বিদ্যুৎবরণী বামা ; মনোহর সাজে
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,
ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সঙ্গীতসাগরে ;
পশি সশঙ্কিতে, সেই সিরাজশিবিরে,
সাবধানে, সশঙ্কিতে, কম্পিত অন্তরে,
না বহে নিশ্বাস যেন, অতি ধীরে ধীরে,
কহ সখি ! কহ দুঃখ-বিকম্পিত স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষণ্ণ অন্তরে !

৩

বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণসিংহাসনে,
বেষ্টিত রূপসীদলে,—বঙ্গ-অলঙ্কার,
কাশ্মীর-কুসুমরাশি ; উজ্জ্বল বরণে
বিমলিন, আভাহীন, স্ফটিকের ঝাড় !
যার মুখ পানে চাহি হেন মনে লয়
এই রূপবতী নারী রমণীর মণি।
ফিরে কি নয়ন আহা ! ফিরে কি হৃদয়,
বারেক নিরখি এই হীরকের খনি ?
নিরখিয়া এই সব সুন্দরী ললনা,
কে বলিবে তিলোত্তমা কবির কল্পনা !

৪

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ ;
আতর-গোলাপ-গন্ধে হইয়া বিহ্বল,
বহিতেছে ধীরে গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ !
শোভে পুষ্পাধারে, স্তম্ভে, কামিনীকুন্তলে,
কোমল কামিনীকণ্ঠে কুসুমের হার ;
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে
শোভিয়াছে মালা, আহা ! দেখ একবার !
দীপমালা, পুষ্পমালা, রূপের কিরণ
করিয়াছে যামিনীর উজ্জ্বল বরণ।

৫

মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে, বিমোহিত করিয়া শ্রবণ ;

মিলাইয়া সেই স্বরে শতেক নবীনা
গাইতেছে, সপ্তস্বর ব্যাপিছে গগন।
পূরাইতে পাপাসক্ত নবাবের মন,
নীচে অর্দ্ধবিবসনা শতেক সুন্দরী ;
সুকোমল মকমল চুম্বিছে চরণ
তালে তালে ; কামে পুনঃ জীবন বিতরি
খেলিছে বিজলীপ্রায় কটাক্ষ চঞ্চল,
থেকে থেকে দীপাবলী হতেছে উজ্জ্বল।

৬

পলাশি-প্রান্তরে নৈশ গগন ব্যাপিয়া,
উথলিছে শত স্রোতে আমোদলহরী ;
দূরে গঙ্গা বহিতেছে রহিয়া রহিয়া,
নিবিড় তিমিরে ঢাকা বসুধা সুন্দরী।
এমন ইন্দ্রিয় সুখ-সাগরে ডুবিয়া,
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন ?
কি ভাবনা শুষ্ক মুখে শূন্য নিরখিয়া,
কেন বা সঙ্গীতে আজি বিরাগ এমন
ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সদা মুগ্ধ যার মন,
অকস্মাৎ কেন তার বৈরাগ্য এমন ?

৭

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ ;
ডুবায়ে নবাবে কালি সমরসাগরে
দিতে সেনাপতি-করে বঙ্গ-সিংহাসন।
ধিক্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ! ধিক্ উমিচাঁদ !
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,

না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ
সম্মুখ-সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিঁড়িলে দাসত্বপাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন ?

৮

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্ল্লভ দুর্ব্বল !
বাঙ্গালি কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক !
ডুবিলি ডুবালি পাপি ! কি করিলি বল্ ,
তোর পাপে বাঙ্গালির ঘটিবে নরক।
যে পাপে ডুবিলি আজি ওরে দুরাচার !
তোর হৃদয়ের রক্তে হইবে বিধান
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ; কি বলিব আর,
প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান।
প্রতিদিন বাঙ্গালির শত মনস্তাপ,
প্রতি মনস্তাপ তোরে দিবে শত শাপ।

৯

সঙ্গীত-তরঙ্গ ভেদি এ পাপ মন্ত্রণা
পশিল কি ভয়াকুল নবাবের মনে ?
সে চিন্তায় নবাব কি এত অন্যমনা ?
কে বলিবে, অন্তর্যামী বিনা কেবা জানে ?
কিংবা রণে কি হইবে ভাবি মনে মনে
কাঁপে কি সিরাজদ্দৌলা থাকিয়া থাকিয়া ?
অথবা অঙ্গনা-অঙ্গ-স্নিগ্ধ-পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া।
আকর্ণ টানিয়া তবে কটাক্ষের বাণ
এক সঙ্গে যত ধনী কর লো সন্ধান !

১০

ঢাল সুরা স্বর্ণ পাত্রে, ঢাল পুনর্ব্বার !
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান
খাও ঢাল, ঢাল খাও। প্রেম-পারাবার
উথলিবে, লজ্জা-দীপ হইবে নির্ব্বাণ।
বিবসনা লো সুন্দরি ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ?—নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধা হাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনীসম বেণী দুলিতেছে পাছে।
চলুক চলুক নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।

১১

কে তুমি গো, একাকিনী আনন্দশিবিরে
কাঁদিতেছ এক পার্শ্বে বসিয়া ভূতলে ?
চিনেছি,—হানিয়া খড়্গ প্রাণপতি-শিরে,
তোমাকে এ দুরাচার আনিয়াছে বলে।
কাঁদ তবে, কাঁদ তুমি রাত্রি যতক্ষণ,
গাও উচ্চৈঃস্বরে আর যতেক রমণী !
উঠিল রমণী-কণ্ঠ ছুঁইল গগন ;—
দ্রুম্ করে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি
এ কি গো ?—কিছু না, শুধু মেঘের গর্জ্জন ;
নাচ, গাও, পান কর, প্রফুল্লিত মন।

১২

পুনঃ ঝনৎকার শব্দে বাজিয়া উঠিল
মুরজ, মন্দিরা, বীণা, সারঙ্গী, সেতার ;

বেহালার পিককণ্ঠে হইতে লাগিল
তানে তানে মুগ্ধচিত্তে উদাস সঞ্চার !
যন্ত্রের স্বর-তরঙ্গে গলা মিশাইয়া
বসন্ত কোকিল কি হে দিতেছে ঝঙ্কার ?
তা নয়, গায়িকা ওই কণ্ঠ কাঁপাইয়া
গাইতেছে ; ক্ষীণকণ্ঠ কোকিল কি ছার !
এক কুহুস্বরে করে সতত চীৎকার,
শত কলকলে বামা দিতেছে ঝঙ্কার !

১৩

সুধু কলকণ্ঠ নহে, দেখ একবার,
মরি, কি প্রতিমাখানি অনঙ্গমোহিনী
নবাবের সম্মুখেতে করিছে বিহার,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী বসন্ত রাগিণী !
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়,
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল।
বিলাসবিলোল, যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল,
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল।

১৪

অর্থহীন, ভাবহীন শ্যামের বাঁশরী
হরিতে পারিত যদি অবলার প্রাণ ;
হেন রূপসীর স্বর, সুধার লহরী
প্রেমপূর্ণ ;—আছে কোন নিরেট পাষাণ
শুনিয়া হৃদয় যার হবে না দ্রবিত ?

যদি থাকে, তার চিত্ত নরক সমান !
হতভাগ্য সেই জন, যে জন বঞ্চিত
সরস সঙ্গীতরসে,—রসের প্রধান !
পাঠক ! বারেক শুন অনন্ত-শ্রবণে
প্রণয়বিষাদ গীত বামার বদনে !

১৫

গীত

"কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম-রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে,
কারো কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুত-প্রতিম প্রেম দূর হ'তে মনোরম
দরশন অনুপম,
পরশনে মৃত্যুফল।
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়,
পাষাণে সে চাহে জল।
আজি যে করিব প্রেম, মনে ভাবি সুধা যেন
বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে,
কালি হবে অশ্রুজল।"

১৬

ওই শুন কলকণ্ঠ, গগনে উঠিয়া,
প্রভাত-কোকিল যেন পঞ্চমে কুহরে ;
ওই পুনঃ সুমধুর কোমল নিক্কণে,
কমলদলের মধ্যে ভ্রমরী গুঞ্জরে।

এই বোধ হয় নব প্রণয়-সঞ্চারে
হইল বামার আহা! সলজ্জ বদন ;
এই হাসিরাশি দেখ অধর-ভাণ্ডারে,—
প্রণয়-কুসুম হ'ল বিকচ এখন।
আবার এখন দেখ, নয়নের জলে
দেখায় পশিল কীট প্রণয়-কমলে!

১৭

এই অশ্রু নবাবের দ্রবিল হৃদয়,
নির্ব্বাপিত কামানল হ'ল উদ্দীপন ;
গগনেতে কাল মেঘ হইল উদয় ;
উছলিল সিন্ধু! মত্ত হইল যবন।
সুপ্ত বাসনার স্রোত হইয়া প্রবল
ছুটিল ভীষণ বেগে, চিন্তার বন্ধন
কোথায় ভাসিয়া গেল ; হৃদয় কেবল
রমণীর রূপে স্বরে হইল মগন।
মুছাইতে অশ্রু কর করিলা বিস্তার,
গ্রুম্ ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার।

১৮

আবার সে শব্দ, ভেদি সঙ্গীততরঙ্গ,
গেল নবাবের কাণে বজ্রনাদ করি ;
ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ,
শিরস্ত্রাণ পড়ি ভূমে দিল গড়াগড়ি।
ইংরাজের রণবাদ্য দূর আম্রবনে
হুঙ্কারিল ভীম রোলে, কাঁপিল অবনী ;
যত যন্ত্র ধরাতলে হইল পতন,
নর্ত্তকী অর্দ্ধেক নাচে থামিল অমনি।

মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যেই বিকচ বদন
হাসিতে ভাসিতেছিল, মলিন এখন !

১৯

বেগে ফরসির নল ফেলিয়া ভূতলে,
আসন হইতে যুবা চকিতে উঠিল ;
ভেসেছিল যেই চিন্তা নারী-অশ্রুজলে,
আবার হৃদয়ে বিষদন্ত বসাইল।
গভীর চরণক্ষেপে, অবনত মুখে,
ভ্রমিতে লাগিল ধীরে চিন্তাকুল মনে ;
যতেক রমণীগণ বসে মনোদুখে
মাথে হাত দিয়া কাঁদে ভূতল-আসনে।
ক্ষণেক নীরবে ভ্রমি যবনরাজন,
দাঁড়াল গবাক্ষে বাহু করিয়া স্থাপন।

২০

দেখিল অনতিদূরে অন্ধকার হরি
জ্বলিছে শত্রুর আলো আলেয়ার প্রায় ;
বহুক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করি,
চমকিল অকস্মাৎ ; ঝরিল ধরায়
একটি অশ্রুর বিন্দু ; একটি নিশ্বাস
বহিল ; চলিল নৈশ-সমীরণ-ভরে
শত্রু-আলোরাশি যেন করিতে বিনাশ ;
কিংবা রাজহিংসা-বিষ মাখি কলেবরে,
চলিল সত্বরে যেন শত্রুর শিবিরে,
বিনা রণে অরিবৃন্দ বধিতে অচিরে।

২১

প্রবল-ঝটিকা-শেষে জলধি যেমন
ধরে সুপ্রশান্ত ভাব, উন্মত্ত তরঙ্গে
কিছুক্ষণ করি বেগে সিন্ধু বিলোড়ন,
ক্রমশঃ বিলীন হয় সলিলের সঙ্গে ;
তেমতি নিশ্বাস শেষে নবাবের মন
হইল অপেক্ষাকৃত স্থির সুশীতল।
মুহূর্ত্তেক মনোভাব করি নিরীক্ষণ
বলিতে লাগিল ধীরে চাহি ধরাতল।
"কেন আজি ?" এই কথা বলিতে বলিতে
অবরুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ শোকে আচম্বিতে।

২২

"কেন আজি মম মন এত উচাটন ?
বোধ হয় বিষে মাখা সকল সংসার !
কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন ?
কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার ?
বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ-রোদন,
সতীত্বরতন-হারা রমণীর মুখ,
নিদারুণ যাতনায় যাদের জীবন
বধিয়াছি, নিরখিয়া তাহাদের মুখ,
হর্ষ-বিকসিত হ'ত যাহার বদন,
তার কেন আজি হ'ল সজল লোচন ?

২৩

"শত্রুর শিবির পানে ফিরালে নয়ন,
প্রত্যেক আলোক ক্যাছে, না জানি কেমনে

নিরখি চিত্রিত মম যত নিদারুণ
অত্যাচার, অনুতাপে জ্বলে উঠে মন।
মনে করি হ'ল মম দৃষ্টির বিভ্রম,
অমনি রুমালে আমি মুছি দুনয়ন ;
কিন্তু হৃদয়েতে যেই কলঙ্ক বিষম,
ঘুচিবে সে দোষ কেন মুছিলে নয়ন ?
পরিষ্কারি নেত্রদ্বয় দেখিলে আবার,
সেই চিত্র স্পষ্টতর দেখি পুনর্ব্বার।

২৪

"দেখি বিভীষিকা মূর্ত্তি ভয়াকুল মনে,
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে,
প্রত্যেকে একটি পাপ চিত্রিয়া গগনে,
দেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ বিধানে।
যেই সব পাপ-কার্য্য করিতে সাধন
কেশাগ্রও কোন দিন কাঁপেনি আমার,
আজি কেন তারি চিত্র করি দরশন,
শিহরিয়া উঠে অঙ্গ কাঁপে বারংবার ?
পাপ পুণ্য কার্য্যকালে সমান সবল,
অনুশোচনাই মাত্র পরিচয়স্থল।

২৫

"এই বঙ্গ রাজ্যে অতি দীন নিরাশ্রয়
যেই সব প্রজাগণ, সারাদিন হায়।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত অতিশয় ;
অনশনে তরুতলে ভূতল-শয্যায়
করিয়া শয়ন, এই নিশীথে নির্ভয়ে,
লভিছে আরাম সুখে তারাও এখন।

আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সময়ে
সুবাসিত কক্ষে কেন বসিয়া এমন
আকাশ পাতাল ভাবি বিষণ্ন অন্তরে ?
রে বিধাতঃ ! রাজদণ্ডে নিদ্রাও কি ডরে ?

২৬

"কি হয় কি হয় রণে, জয় পরাজয়,
এই ভাবনায় কি গো চিন্তাকুল মন ?
নিতান্ত যদ্যপি রণে হয় পরাজয়,
না পারিব কোন মতে বাঁচাতে জীবন ?
আমি ত সমরক্ষেত্রে, প্রাণান্তে আমার,
যাইব না, পশিব না বিষম সংগ্রামে,
অরিবৃন্দ নখাগ্রও দেখিবে না যার,
কেমনে অলক্ষ্য তারে বধিবে পরাণে ?
তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চয়,
রাজদুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়।

২৭

"কে বল আমার মত ভবিষ্যত কথা
ভাবিতেছে এ প্রান্তরে বসিয়া বিরলে ?
কে বল হৃদয়ে এত পাইতেছে ব্যথা,
ভাবি ভূতপূর্ব্ব কথা ভাবি কর্ম্মফলে ?
বাজাইয়া করতালি, বাজায়ে খঞ্জনী,
দুই হাতে তালি দিয়া প্রহরী সকল,
নাচিতেছে, গাইতেছে ; চিন্তা-কালফণী
নাহি দংশে হৃদয়েতে, দহি অন্তস্থল।
সকলি আমোদে মত্ত নাহি কোন ভয়,—
কি-হয় কি হয় রণে,—জয় পরাজয় ?

২৮

"অথবা কি ভয়-মেঘে হৃদয়-গগন
আবরিবে তাহাদের ? নাহি রাজ্য ধন,
নাহি সিংহাসন, তবে কিসের কারণ
হবে তারা চিন্তাকুল বিষাদিত মন ?
মৃত্যু ?—মৃত্যু দরিদ্রের তুচ্ছ অতিশয়।
করিতে আমার চিত্তে সন্তোষ বিধান
মরিয়াছে শত শত ; তবে কোন্ ভয় ?
দুঃখীর জীবন মৃত্যু একই সমান !
আমাদের ইচ্ছামত মরিতে, বাঁচিতে,
হয়েছে তাদের সৃষ্টি এই পৃথিবীতে।

২৯

"যা হবে আমার হবে ; তাদের কি ভয় ?
ভাঙ্গে যেই ঝটিকায় দেউল প্রাচীর,
উপাড়িয়া ফেলে উচ্চ মহীরুহচয়,
পরশে কি কভু তৃণরাশি পৃথিবীর ?
করে কি উচ্ছেদ নীচ ক্ষুদ্র গুল্ম যত ?
হায় রে তেমতি এই আসন্ন সমরে,
যায় যাবে মম রাজ্য, আমি হব হত ;
কি দুঃখ হইবে তাহে প্রজার অন্তরে ?
এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।

৩০

"কিংবা মিরজাফরের মন্ত্রে সৈন্যদল
হইয়াছে উপদিষ্ট, কে বলিতে পারে ?

তবে এই রণসজ্জা চক্রান্ত কেবল,
প্রবঞ্চনা-ইন্দ্রজালে ভুলালে আমারে ?
হয় ত আমারে কালি যত দুরাচার
অর্পিবে ক্লাইবে, কিংবা বধিবে পরাণে ;
তাই বুঝি তাহাদের আনন্দ অপার,
নাচিতেছে, গাইতেছে ! অথবা কে জানে
আততায়ী সেনাপতি পাপী কুলাঙ্গার,
শিবির করিবে আজি সমাধি আমার।

৩১

"নিশ্চয় বিদ্রোহী তারা নাহিক সংশয় ;
নতুবা ক্লাইব কোন্ সাহসের ভরে,
ওই ক্ষুদ্র সৈন্য লয়ে,—নাহি মনে ভয়—
এ বিপুল সেনা মম সম্মুখ সমরে ?
সরসীনিঃসৃত স্রোতে কোন মূঢ় জনে
সাহসে সিন্ধুর স্রোত চাহে ফিরাইতে ?
কিংবা কোন্ মূর্খ বল ভীম প্রভঞ্জনে
পাখার বাতাসবলে চাহে বিমুখিতে ?
না জানি কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে স্থির ;
অবশ্য হয়েছে কোন মন্ত্রণা গভীর !

৩২

"আমি মূর্খ, সর্ব্বনাশ করেছি আমার ;
মিরজাফরের এই চক্রান্ত জানিয়া,
রেখেছি জীবিত, ভুলে শপথে তাহার ;
ক্লাইবের পত্রে ছিনু নিশ্চিন্ত হইয়া।
কে জানে ইংরাজজাতি এত মিথ্যাবাদী ?
এত আত্মম্ভরী ? এত কাপট্য-আধার ?

কথায় স্বপক্ষ হয়, কার্য্যে প্রতিবাদী ?
তাদের ভরসা আশা মরীচিকা সার ?
এখন কোথায় যাই, কি করি উপায়,
বিশ্বাসঘাতকী হায় ! ডুবা'ল আমায় !

৩৩

"যদি কোন মতে কালি পাই পরিত্রাণ,
মিরজাফরের সহ যত বিদ্রোহীর
মনোমত সমুচিত দিব প্রতিদান ;
বধিব সবংশে। আগে যত রমণীর
বিতরি সতীত্বরত্ন আপন কিঙ্করে
তাদের সম্মুখে ; পরে সস্ত্রীক সন্তান
কাটিব, শোণিত পিতা পতির উদরে
প্রবেশি বিদ্রোহ-তৃষা করিবে নির্ব্বাণ
পরে তাহাদের পালা,—প্রথম নয়ন—
ও কি !"—কক্ষে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ,

৩৪

ভাবিল—আসিছে মিরজাফরের চর,
যমদূত ; লুকাইল শিবিরকোণায়।
যখন জানিল নহে শমন-কিঙ্কর,
নিজ অনুচর মাত্র, বটপত্র প্রায়
কাঁপিতে কাঁপিতে, ভয়ে হইয়া অস্থির,
বসিল ফরাসে ধীরে শিরে হাত দিয়া।
চিন্তিল অনেক ক্ষণ,—"করিলাম স্থির,
যা থাকে কপালে আর, অদৃষ্ট ভাবিয়া,
ক্লাইবে লিখিব পত্র, দিব রাজ্য ধন
বিনা যুদ্ধে, যদি রক্ষে আমার জীবন।"

৩৫

অমনি লেখনী লয়ে লিখিতে বসিল,
লিখিতে লাগিল পত্র,—চলিল লেখনী।
আবার কি চিন্তা মনে উদয় হইল,
অর্দ্ধ পত্রে শুদ্ধ কর থামিল অমনি।
"কি বিশ্বাস ক্লাইবেরে! নিয়ে সিংহাসন,
নিয়ে রাজ্যভার"—এমন সময়ে
কাণাতে মানবছায়া হইল পতন;
লেখনী ফেলিয়া দূরে পুনঃ প্রাণভয়ে
লুকাইল, শত্রুচর ভাবিয়া আবার;
কিন্তু বেগমের পরিচারিকা এবার।

৩৬

এইবার হতভাগা বুকে হাত দিয়া
বসিয়া পড়িল, আর চরণ না চলে।
যায় যথা কাষ্ঠমঞ্চ ক্রমশঃ সরিয়া,
উদ্বন্ধনে দণ্ডিতের বদ্ধ পদতলে,
তেমতি এ অভাগার বোধ হ'ল মনে,
পৃথিবী চরণতলে, যেতেছে সরিয়া
কাঁপিতে লাগিল প্রাণ দ্রুত প্রকম্পনে,
নির্গত হইবে যেন হৃদয় ফাটিয়া;
বহিতে লাগিল নেত্রে অশ্রু দর দরে;
বহুক্ষণ এই ভাবে চিন্তিল অন্তরে।

৩৭

"না,—এই যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি,
এখনি পড়িব মিরজাফরের পায়ে,
রাখিয়া মুকুট, রাজদণ্ড, তরবারি

তাহার চরণতলে, পড়িয়া ধরায়
মাগিব জীবন-ভিক্ষা অন্তরে তাহার
অবশ্য হইবে দয়া।”—ভাবিয়া অন্তরে
মন্ত্রীর শিবিরপানে উন্মাদ-আকার
—বিস্তৃত নয়ণদ্বয়, কম্প কলেবরে—
ছুটিল ; আসিল যেই শিবিরের দ্বারে,
শত ভীম নরহন্তা স্বজিল আঁধারে।

৩৮

“অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন।”—
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ’য়ে পড়িল ভূতলে
অমনি বিদ্যুৎ-বেগে করিয়া বেষ্টন
ধরিল রমণী ভুজ-মৃণাল-যুগলে।
শিবিরের এক পার্শ্বে পর্য্যঙ্ক উপরে,
বসিয়া নীরবে রাণী প্রথম হইতে,
নবাবের ভাব দেখি, বিষণ্ণ অন্তরে
শয্যা ভিজাইতেছিল নয়নবারিতে ;
নবাবে ছুটিতে দেখি, উন্মাদ-আকার,
গিয়াছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তাহার।

৩৯

কামিনী-কোমল-স্নিগ্ধ-অঙ্গ পরশিতে,
কিছু পরে বঙ্গেশ্বর চেতন পাইয়া,
অবোধ শিশুর মত লাগিল কাঁদিতে,
বিষাদিনী প্রেয়সীর গলায় ধরিয়া।
রোদনের শব্দে পরিচারিকামণ্ডল
আসিয়া, নবাবে নিল পর্য্যঙ্কে তখনি,
নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র গেলা অস্তাচল।

"এ কি নাথ !" জিজ্ঞাসিল বিষাদিনী ধনী ;
অভাগা অস্ফুটস্বরে বলিল তখন,
"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন।"

৪০

নিদাঘনিশির শেষে নীরব অবনী ;
নিবিড় তিমিরে ঢাকা ভূতল গগন ;
দুই এক তারা হ'য়ে মলিন অমনি
জ্বলিতেছে, শিবিরের আলোর মতন।
ভবিষ্যৎ ভাবি যেন বঙ্গ বিষাদিনী
কাঁদিতেছে ঝিল্লিরবে ; পলাশি-প্রাঙ্গণ
ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি চিত্তবিদারিণী,
মুহূর্ত্ত নবাব ধ্বনি করিল শ্রবণ ;—
অন্ধকারে ধ্বনি যেন নিয়ত-বচন
কি বলিল, শিহরিল সভয় যবন

৪১

"অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন,"—
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হ'ল কলেবর ;
নিদাঘশর্ব্বরী-শেষে নৈশ সমীরণ,
বহিছে স্বনিয়া আম্রকানন ভিতর।
অতিক্রমি বাতায়ন শীতল সমীর,
ব্যজন করিতেছিল নবাবে তখন ;
ভাবনায়, অনিদ্রায় হইয়া অধীর,
অমনি অজ্ঞাতে ধীরে মুদিল নয়ন
বিকট স্বপন যত দেখিল নিদ্রায়,
বলিতে শোণিত, কণ্ঠ, শুকাইয়া যায়।

৪২

প্রথম স্বপ্ন

"রাজ্যলোভে মুগ্ধ হ'য়ে অরে দুরাচার !
অকালে আমারে, দুষ্ট ! করিলি নিধন !
কালি রণে প্রতিফল পাইবি তাহার,
সহিবি রে অনুতাপ আমার মতন।"

দ্বিতীয় স্বপ্ন

"সিরাজ, তোমার আমি পিতৃব্যকামিনী ;
হরি মম রাজ্যধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী ;
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর।"

তৃতীয় স্বপ্ন।

"আমারে ডুবায়ে জলে বধিলি জীবনে,
ডুবিবে জীবন-তরি কালি তোর রণে।"

৪৩

চতুর্থ স্বপ্ন।

"আমি পূর্ণগর্ব্ভবতী নবীনা যুবতী ;
এই দেখ গর্ব্ভ মম করিয়া বিদার,
দেখেছিলি সুত মম, ওরে দুষ্টমতি !
কালি রণে পাবি তুই প্রতিফল তার।"

পঞ্চম স্বপ্ন।

"আমি সে হোসেন্ কুলি, ওরে রে দুর্জ্জন !
যারে তুই নিজ হস্তে করিলি নিপাত,
মম শাপে তোর রক্ত হইবে পতন,
যেই খানে করেছিলি মম রক্তপাত ;

নিদ্রা যাও আজি, পাপি, জন্মের মতন,
অনন্ত-নিদ্রায় শীঘ্র মুদিবে নয়ন।”

৪৪

ষষ্ঠ স্বপ্ন।

“পূরাইতে পাপ-আশা, বালিকা-বয়সে
বলেতে আমারে, পাপি, করি আলিঙ্গন,
বধিলি জীবন মম বিবাহ দিবসে ;
হারাইবি সেই পাপে প্রাণ, রাজ্য, ধন।”

সপ্তম স্বপ্ন।

“রে পাপিষ্ঠ ! অন্ধকূপে যম-যাতনায়,
জান না কি আমাদের করেছ নিধন ?
কালি রণে স্বদেশীর হইয়া সহায়,
অধীনতা-রক্তে বঙ্গ দিব বিসর্জ্জন ;
দেখিবি, দেখিবি পাপি ! জীয়ন্তে যেমন,
ইংরাজের প্রতিহিংসা ম’লেও তেমন !”

৪৫

তামসী-রজনী-শেষে সুনীল অম্বরে
বঙ্কিম রজত-রেখা ভাসিল এখন,
বঙ্গ-ভবিষ্যৎ, আহা, ভাবিয়া অন্তরে
হয়েছে কঙ্কাল-শেষ নিশামণি যেন;
সশস্ত্র সমর-মূর্ত্তি করি দরশন,
ভয়ে নিশীথিনীনাথ ছিল লুকাইয়া,
এবে ধীরে দেখা দিল, পলাশি-প্রাঙ্গণ,
বৃক্ষ-অন্তরাল হ’তে, নীরব দেখিয়া।

কালি যাহা অস্ত্রে অস্ত্রে হ'বে বিদারিত,
আজি সেই রঙ্গভূমি নীরব, নিদ্রিত।

৪৬

নীরবে উঠিল শশী ; নীরবে চন্দ্রিকা
নিরখিল, আলিঙ্গিতে ধরি বঙ্গগলে,
কাঁদিয়াছে বঙ্গ চির-পিঞ্জর-সারিকা,
কতশত মুক্তাবলী শ্যাম দূর্ব্বাদলে।
নিরখিল কত পত্র, কত ফুল ফল,
তিতিয়াছে দুঃখিনীর নয়নের নীরে ;
নীরবে শিবির-শ্রেণী শোভিছে কেবল,
ধবল-বালুকা-স্তূপ যথা সিন্ধু তীরে ;
অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে যবে মোহিল পাণ্ডব।

৪৭

জগত-ঈশ্বরী নিদ্রা, শান্তির আধার,
সিংহাসন-চ্যুত আজি পলাশি-প্রাঙ্গণে ;
মানব-নয়ন-রাজ্যে নাহি অধিকার,
বিষাদে ভ্রমিছে আজি এই রণাঙ্গণে।
অজ্ঞাতে, অদৃশ্য করে, প্রেম-পরশনে,
করে যদি নিমীলিত কাহারো নয়ন ;
প্রহরীর পদ-শব্দে ; পবন-স্বননে,
চকিতে অভুক্ত তন্দ্রা ভাঙ্গে সেইক্ষণ।
ভয়, মানবের সুখ-সম্ভোগ বিনাশি,
ভীষ্ম-শরশয্যা আজি করেছে পলাশি !

৪৮

গভীর নীরব এবে নবাব-শিবির।
দাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে
কেবল জ্বলিছে দীপ ; বহিছে সমীর,
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর সর রবে।
ঘন ঘন নবাবের মলিন বদনে
বিকাশিছে স্বেদ-বিন্দু উৎকট স্বপন।
পর্য্যঙ্ক উপরে বসি বিষাদিত মনে
শান্ত অশ্রুমুখী সেই রমণীরতন।
রুমালে কোমল করে সেই স্বেদজল
নীরবে কাঁদিয়া রাণী মুছিছে কেবল।

৪৯

প্রেমপূর্ণ স্থির নেত্রে, আনত বদনে,
চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে।
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরি আননে
পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শয্যা উপধানে।
এক ভুজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে,
অন্য করে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল ;
থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল।
মুছাইছে স্বেদবিন্দু বামার নয়ন
অমর-দুর্ল্লভ অশ্রু করিছে বর্ষণ !

৫০

নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী,
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ-উরু-উপধানে—
ফেলেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,

চাহি পথশ্রান্ত পতি নরপতি পানে ;
অথবা বিজন বনে, তমসা নিশীথে,
মৃতপতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী,
ফেলেছিল যেই অশ্রু ; এই রজনীতে
ফেলিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী।
তুচ্ছ বঙ্গ-সিংহাসন ! এই অশ্রুতরে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপদ অম্লান অন্তরে।

৫১

এ দিকে ক্লাইব নিজ শিবিরে বসিয়া,
জাগরণে, ব্যস্ত মনে, কাটিছে রজনী ;
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মনেতে ভাবিয়া,
থেকে থেকে ভয়ে বীর কাঁপিছে অমনি
"এত অল্প সেনা লয়ে"—ভাবিছে—"কেমনে
পরাজিব অগণিত নবাবের দল ?
কে জানে যদ্যপি হয় পরাজয় রণে,
ইংলণ্ডের সব আশা হইবে বিফল ;
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি একজন আর,
শ্বেতদ্বীপে কভু নাহি ফিরিবে আবার।

৫২

"একেত সংখ্যায় অল্প সৈনিকের দল ;
তাহাদের মধ্যে তাহে নাহি এক জন
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে ; প্রায়ত সকল
সমরে অদূরদর্শী শিশুর মতন।
অধিকাংশ এইমাত্র লেখনী ছাড়িয়া
অনিচ্ছায় তরবারি লইয়াছে করে ;

কেমনে এমন ক্ষীণ তৃণদল দিয়া
অসংখ্য অশনিবৃন্দ কাটিব সমরে ?
ফিরে যাই, কাজ নাই বিষম সাহসে,
স্ব-ইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্র-মুখে পশে ?

৫৩

"ফিরে যাব ? কোথা যাব ? স্বদেশে আমার ?
ছমাসের পথ বল যাইব কেমনে ?
ওই ভাগীরথী নদী না হইতে পার,
আক্রমিবে কালসম দুরন্ত যবনে ;
জনে জনে নিজ হস্তে বধিবে জীবনে,
অথবা করিবে বন্দী রাজ-কারাগারে ;
কাঁদি যদি দীনভাবে পড়িয়া চরণে
জীবন্ত নির্দ্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে।
কি কাজ পলায়ে তবে শৃগালের প্রায়,
যুঝিব, শুইব রণে অনন্ত শয্যায়।

৫৪

"আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব জীবন ;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হ'লে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন।
করিব না, করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ ;
মরিব, মারিব শত্রু, করিব সংহার,
বলিলাম এই অসি করি আস্ফালন।
শ্বেতদ্বীপ ! জিনি রণ ফিরিব আবার
তা না হয়, এইখানে বিদায় সবার।"

৫৫

স্বগত চিন্তার স্রোত না হইতে স্থির,
অজ্ঞাতে অন্যত্র চিত্ত হ'ল আকর্ষিত ;
বৃটিশ যুবক কেহ হইয়া অধীর,
বর্ষিতেছে প্রেমময় মধুর সঙ্গীত ; –

১

সঙ্গীত

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
কি বলিয়া প্রিয়তমে ! হইব বিদায় ?
বচন না সরে মুখে,
হৃদয় বিদরে দুঃখে,
উচ্ছ্বসিত আজি প্রিয়ে ! প্রেম-পারাবার
অনন্ত লহরী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ;
প্রত্যেক কল্লোলে প্রাণ
গায় তব প্রেমগান,
প্রত্যেক হিল্লোলে আজি চুম্বে বারংবার
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার ।

২

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার
সমুদ্রের এক প্রান্তে ভাসিলে চন্দ্রমা,
সীমা হ'তে সীমান্তরে
হাসে সিন্ধু সেই করে,
রজত চন্দ্রিকাময় হয় পারাবার
তেমতি যদিও তুমি ইংলণ্ডে উদিত,
প্রিয়ে তব রূপরাজি
ভারতে ভাসিছে আজি,

ভাসিতেছে প্রিয়তমে ! চিত্তে অভাগার ;
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৩

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
যেই দিন দুরাকাঙ্ক্ষা-তরী আরোহিয়া
লঙ্ঘিয়া প্রবল সিন্ধু,
ছাড়িয়া প্রণয়-ইন্দু,
আসিয়াছে দেশান্তরে প্রণয়ী তোমার,
সেই দিন প্রিয়তমে ! আবার, আবার,
আজি এই রণস্থলে,
দুর্নিবার স্মৃতিবলে,
পড়ি মনে উছলিছে প্রেম-পারাবার ;
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৪

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
সরল তরল হাসি মাখিয়া অধরে,
বলেছিলে—'প্রিয়তম !
পরাতে গলায় মম,
আনিবে না গোলকণ্ডা হীরকের হার ?'
আবার সজল নেত্রে, বঙ্কিম গ্রীবায়
রেখে মম বাম কর,
বলেছিলে,—'প্রাণেশ্বর !
এই হার বিনে কিছু নাহি চায় আর,
প্রিয়া কেরোলাইনা তোমার ।'

৫

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
যেই প্রেম-অশ্রুরাশি আজি অভাগার
ঝরিতেছে নিরবধি,
তরল না হ'ত যদি,
গাঁথিতাম যেই হার, তব উপহার;
কি ছার ইহার কাছে গোলকণ্ডাহার !
প্রতি অশ্রু আলোকিয়ে,
বিরাজিতে তুমি প্রিয়ে !
তব প্রেম বিনে মূল্য হ'ত না তাহার,
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৬

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
এই ছিল সারা নিশি তমসা রজনী ;
এই মাত্র সুধাকর
বরষি বিমল কর,
রঞ্জিল কিরণজালে সকল সংসার !
হায় ! এ বিষাদ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে,
তব রূপ নিরূপম,
আঁধার হৃদয় মম,
আলোকিবে পুনঃ কি এ জনমে আবার ?
প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !

৭

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
কিংবা কালি,—ভেবে বুক বিদরিয়া যায় !—

কালি ওই রণাঙ্গনে,
অভাগার দুনয়নে,
সেইরূপ—এই আশা—হইবে আঁধার ?
তবে অশ্রুসিক্ত তব ক্ষুদ্র চিত্রখানি
রাখিয়া হৃদয়োপরে,
মরিব প্রণয়ভরে,
জন্মের মতন আহা ! ডাকি একবার,—
'প্রিয়ে । কেরোলাইনা আমার ?'

৮

"প্রিয়ে ! কেরোলাইনা আমার !
যায় নিশি,—এইনিশি—প্রেয়সি ! আবার,
পুনঃ এই সুধাকর,
তারাময় নীলাম্বর,
হইবে কি সমুদিত নয়নে আমার ?
জীবনের শেষ দিবা হয়ত প্রভাত
হইতেছে পূর্ব্বাচলে,
কালি নাশি নেত্রজলে,
হতভাগা স্মরিবে না,—ডাকিবে না আর,—
'প্রিয়ে ! কোরোলাইনা আমার !' "
নীরবিল যুবা—যেন নৈশ সমীরণে
হইল জীবন মন শেষ তানে লয় !
সেই তান ক্লাইবের পশিল শ্রবণে ;
ঝরিল একটি অশ্রু, দ্রবিল হৃদয় ।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ হইল নির্গত—
"প্রিয়তমে মেস্কিলিন !—জনমের মত !"

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

চতুর্থ সর্গ

যুদ্ধ

১

পোহাইল বিভাবরী পলাশি-প্রাঙ্গণে,
পোহাইল যবনের সুখের রজনী;
চিত্রিয়া যবন-ভাগ্য আরক্ত গগনে,
উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি।
শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী,
প্রবেশিলা আম্রবনে, প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ-শতদলে ভাসিল অমনি;
ক্লাইবের মনে হ'ল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।

২

নীরবে পোহাল নিশি; নীরব সকল;
রণক্ষেত্রে একবারে না বহে বাতাস;
একটি পল্লব নাহি করে টলমল;
একটি যোদ্ধার আর নাহি বহে শ্বাস।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শালিকের দল,
নীরবে বসিয়া স্থির শাখার উপরে।
দূরে নীল গঙ্গা এবে শান্ত অচঞ্চল;
একটি হিল্লোল নাহি কাঁপে সরোবরে।
রণপ্রতীক্ষায় স্থির পলাশি-প্রাঙ্গণ,
প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন।

১

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

২

নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনীভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

৩

নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীম রবে দিগঙ্গন,
কাঁপাইয়া ঘন ঘন,
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।

৪

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল ধ'রে
দ্বিজ কোষাকুষি করে
দাঁড়াইলা বজ্রাহত পথিক যেমন।

৫

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।

৬

ভাগীরথী উপাসক আর্য্যসুতগণ,
ভক্তিভরে কিছুক্ষণ,
করি গঙ্গা দরশন,
'গঙ্গামাই' ব'লে সবে ডাকিল তখন।

৭

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।

৮

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরব গর্জ্জনে,
সলিল সঞ্চয় করি,
যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈল প্রতি তাড়িত-গমনে

৯

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম-লতা-বন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।

১০

তেমতি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি,
এক স্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।

১১

অকস্মাৎ একবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
ভীষণ সংহার-দৃষ্টি !
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল তিরোধান।

১২

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয়-মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রক্ষিতে সেনায়।

১৩

"সম্মুখে—সম্মুখে !"—বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ-ধার,
বৃটিশের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

১৪

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।

১৫

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল-কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

১৬

পাখিগণ সশঙ্কিত করি কলরব,
পশিল কুলায়ে ডরে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফাল নীরব !

১৭

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন ;
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি !
বাজিল বৃটিশ বাদ্য জলদ-নিস্বন ।

১৮

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন ;
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীম রব, ফাটিল গগন !

১৯

সেই ভীম রবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা ।

২০

খেলিছে বিদ্যুৎ এ কি ধাঁধিয়া নয়ন !
শতে শতে তরবার
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন ।

২১

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মিরমদন পতন !

২২

"হুর্‌রে ! হুর্‌রে !"—করি গর্জ্জিল ইংরাজ ;
নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ !

২৩

"দাঁড়া রে ! দাঁড়া রে ফিরে ! দাঁড়া রে যবন !
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ !
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"—
গর্জ্জিল মোহনলাল—"নিকট শমন !

২৪

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।

২৫

"ভারতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম ;
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে
মরিবি, মরিবি, ওরে যবনসন্তান !

২৬

"সেনাপতি ! ছি ছি এ কি ! হা ধিক্ তোমারে
কেমনে বল না হায় !
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে ?

২৭

"ওই দেখ ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ !
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ?

২৮

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি,দেখিছ আর ?

২৯

"ভেবেছ কি সুধু রণে করি পরাজয়,
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয় ?

৩০

"মূর্খ তুমি !—মাটি কাটি লভি কহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায় ।
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর ?

৩১

"কিংবা, যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দুজাতি,
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্তকাল বুঝি এই উপস্থিত !

৩২

"সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয় ।
দেখিবে তাদের হায় !
রাজা, রাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময় ।

৩৩

"নিশ্চয় জানিও রণে হ'লে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল-ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা-বিষে হবে জীবন সংশয় !

৩৪

"যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিও মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত ।

৩৫

"অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার ।

৩৬

"সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর!

৩৭

"এক দিন—একদিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন,
যন্ত্রণা অপরিসীম
নাহি সহি যেন নর-গৃধিনীর করে।

৩৮

"হারাস্ নে, হারাস্ নে, রে মূর্খ যবন।
হারাস্ নে এ রতন!
এই অপার্থিব ধন!
হারাইলে আর নাহি পাইবি কথন।

৩৯

"বীরপ্রসবিনী যত মোগল রমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে
প্রসবিল কুলাঙ্গারে;
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি।

৪০

"প্রণয়-কুসুমহার, রে ভীরু দুর্ব্বল!
পরাইলি যে গলায়,
বল না রে কি লজ্জায়
পরাইবি সে গলায় দাসত্ব শৃঙ্খল?

৪১

"চির-উপার্জ্জিত সেই কুলের গৌরব !
কেমনে সে পূর্ণশশী
কলঙ্কে করিলি মসী ?
ততোধিক যবনের কি আছে বিভব ?

৪২

"ভুবন-বিখ্যাত সেই যশের কারণ,
বনিতা, দুহিতা তরে,
লও অসি, লও করে,
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ।

৪৩

"কোথায় ক্ষত্রিয়গণ সমরে শমন !
ছিছি ছিছি এ কি কাজ !
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন ?

৪৪

"বীরের সন্তান তোরা বীর অবতার ;
স্বকুলে দিলি রে ঢালি
এমন কলঙ্ককালি,
শৃগালের কাজ, হয়ে সিংহের কুমার !

৪৫

"কেমনে যাবি রে ফিরে ক্ষত্রিয় সমাজে ?
কেমনে দেখাবি মুখ ?
জীবনে কি আছে সুখ ?
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে !

৪৬

ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায় ;
সে বীরত্ব-প্রভাকরে
অর্পি, ভীরু ! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবি ঘরে কি ছার আশায় ?

৪৭

"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান !
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব, সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ !

৪৮

"চল তবে ভ্রাতাগণ ! চল পুনর্ব্বার !
দেখিব ইংরাজদল,
শ্বেত-অঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার ?

৪৯

"বীর-প্রসূতির পুত্র আমরা সকল ;
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেত-অঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল !

৫০

"দেখাব ভারতবীর্য্য দেখাব কেমন ;
বলে যদি হিমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটি চরণ !

৫১

"যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে
ডুবায় সিন্ধুর জলে,
তথাপি ক্ষত্রিয়দলে
টলাইতে না পারিবে, বলে কি কৌশলে।

৫২

"সহে না বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ!
চল সবে রণস্থলে!
দেখিব কে জিনে বলে!
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, দেখাব কেমন।"

৫৩

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল, ফিরিল যবন;
যেমতি জলধিজলে
প্রকাণ্ড তরঙ্গদলে
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন!

৫৪

বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্গিরণ,
জলধরমধ্যে যেন অশনিসম্পাত।

৫৫

নাচিছে অদৃষ্ট দেবী, নির্দ্দয়-হৃদয়!
এই বৃটিশের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে,
এই বার ইংরাজের হ'ল পরাজয়

৫৬

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন, —
“ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ।
কর অস্ত্র সম্বরণ!
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।”

৫৭

উত্থিত কৃপাণ-কর হইল অচল ;
সম্মুখ চরণদ্বয়
পবনে উত্থিত হয়,
দাঁড়াল, নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল

৫৮

যেমতি শিখর ত্যাগি’ পার্ব্বতীয় নদী,
করি তরু উন্মূলন,
ছিঁড়ি গুল্ম-লতা-বন,
অবরুদ্ধ হয় শৈলে অৰ্দ্ধ পথে যদি,

৫৯

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ,
যদি কোন মতে তারে
বারেক টলাতে পারে,
উপাড়িয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

৬০

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ সঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।

৬১

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়,
লাগিল, সঙ্গিন-ঘায়
বরিষার ফোঁটা প্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

৬২

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।

৬৩

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিত-আরক্ত-কায়,
অস্ত গেল রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।

১

নিবিয়াছে মহাঝড় ; রণ-প্রভঞ্জন,
ভীম পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায়, শান্ত হয়েছে এখন ;
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন
দেখিলা সমরক্ষেত্র, মুহূর্ত্ত তুলিয়া
ম্লান মুখ ; ক্ষত দেহে রক্ত-প্রস্রবণ

ছুটিল, পড়িল শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া
চাহি অস্তমিত প্রায় প্রভাকর পানে,
বলিতে লাগিল শোক-উচ্ছ্বসিত প্রাণে ।—

২

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব ! করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ-রজনী !
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে যবন রাজ্য যেও না তপন !
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া, আহা ! ডুবিছ এখন !
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন !

৩

"অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি !
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন !
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে, আহা বলে কোন জন !
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন ;
ভীষণ সময়স্রোত, হায় অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী, করে নিমগন !
সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারা'ল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য সিংহাসন ।

৪

"কোথায় ভারতবর্ষ,—কোথায় বৃটন !
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপী কলেবর।
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত ;
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না বৃটন ;
পবনের গতি কিংবা কল্পনার রথ,
কোন কালে এত দূর করেনি গমন।
আকাশ-কুসুম কিংবা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন,

৫

"সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয় ;
কখনো হইবে কি না, জানে ভবিষ্যত,
এক দিন,—দুই দিন,—বহুদিন আর,
কাষ্ঠপুতুলের মত অভাগা যবন,
বঙ্গ-রঙ্গভূমে নাহি করিবে বিহার ;
কলঙ্কিত করিবে না বঙ্গ-সিংহাসন।
আজি, নহে কালি, কিংবা দুই দিন পরে
অবশ্য যাইবে বঙ্গ ইংলণ্ডের করে।

৬

"কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন !
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্ব্বরী !

আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দুচিত্ত নাহি,—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা আশায় পূরিত ?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর,
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার !

৭

"নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু জলে ?
যাও তবে, যাও দেব ! কি বলিব আর ?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কায বল না, আহা ! ফিরিয়া আবার ?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ !
কালি পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিবে যখন
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।

৮

"আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার ;
ভারত-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর !
ফিরিবে না মৃতদেহে বিগত জীবন,

বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল ;
মৃতদেহ-নিপীড়িত শুষ্ক তৃণগণ
কিছুদিন পরে পুনঃ পাবে নব বল ;
এবে মৃতদেহতলে, বৎসর অন্তরে
জনমিবে পুনর্ব্বার তাদের উপরে।

৯

"এস সন্ধ্যে ! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝল্‌মল ?
কিংবা শুনে যবনের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছে কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত ?
এস শীঘ্র, প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও যবনমুখ দুঃখে অবনত !
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল !
রাশি-রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন !

১০

"কালি সন্ধ্যাকালে এই হতভাগাগণ,—
অহঙ্কারে স্ফীতবুক রমণীমণ্ডলে ;
কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন
আমোদে ভাসিতেছিল মন-কুতূহলে।
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে ;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধর-কুন্তল,
সায়াহ্নে শায়িত হ'ল অনন্ত শয়নে।

বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন !

১১

"আসিলে যামিনী দেবী যে বঙ্গ-ভবন,
আমোদে পূর্ণিত হ'ত, সঙ্গীত-হিল্লোল
উথলিত ব্যাপী ওই সুনীল গগন,
আজি সে বঙ্গেতে সুধু রোদনের রোল !
পতিহীনা, পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা নারী,
ভ্রাতার বিয়োগে ভ্রাতা, করে হাহাকার ;
বজ্রসম পুত্রশোক সহিতে না পারি,
কাঁদে কত পিতা ভূমে হয়ে দীর্ঘাকার।
আজি অন্ধকার-পূর্ণ বঙ্গের-সংসার
কোন ঘরে নাই ক্ষীণ আলোক-সঞ্চার।

১২

"এই নহে ভারতের রোদনের শেষ ;
পলাশি-যুদ্ধের নহে এই পরিণাম।
যেই শক্তি-স্রোতস্বতী ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রাম
হিমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে, লঙ্কাদ্বীপে, লঙ্ঘি পারাবার।
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার !
যবে পূর্ণবলে ক্রমে হবে বলবতী,
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী ?

১৩

"পলাশিতে আজি যেই ধবল জলদ
ভারত-অদৃষ্টাকাশে হইল সঞ্চার,
তিল তিল বৃদ্ধি হয়ে এ শ্বেত নীরদ
ধরিবে ভীষণ মহামেঘের আকার।
জুড়িয়া ভারত-ভূমি হবে অন্ধকার;
বহিবে প্রলয়-ঝড়, ভীম প্রভঞ্জন;
যত পুরাতন রাজ্য হবে ছারখার;
উড়িয়া যাইবে রাজা, রাজ্য সিংহাসন।
কিন্তু এই ঝড় যবে হইবে অন্তর,
ভাসিবে ভারতাকাশে শান্তি-সুধাকর।

১৪

"শ্বেত দ্বীপ! আজি তব কি সুখের দিন
যে রত্ন হইল তব মুকুট-ভূষণ,
একেবারে হ'য়ে হিংসা আশার অধীন,
সমুদয় ইউরোপ করিবে দর্শন।
যাও তবে সমীরণ, ঝড়বেগ ধরি,
বহ এই শুভ বার্ত্তা ইংলণ্ড-ঈশ্বরে!
শুনিয়া সাগরমাঝে শ্বেতাঙ্গ-সুন্দরী
নাচিবে, মরাল যেন নীল সরোবরে।
হইবে সমস্ত দ্বীপ প্রতিধ্বনিময়,
গম্ভীরে সাগরে গাবে ইংলণ্ডের জয়।

১৫

"আর ভারতের?—সেই চির অধিনীর?
ভারতেরো নহে আজ অসুখের দিন।

পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর
কিবা সুখ, কি অসুখ ?—সমান অধীন।
পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হ'তে সুখী সমধিক
চাহিনা স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
যদি পাই—কিন্তু হায় ! ফুরাল স্বপন !

১৬

"ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন।
আজি হ'তে যবনেরা হ'ল হতবল,
কিবা ধনী, মধ্যবিৎ কিবা দীন হীন,
আজি হ'তে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।
ফুরাইল যবনের রাজ্য-অভিনয় ;
এত দিনে যবনিকা হইল পতন ;
করাল কালের গর্ভে, বিস্মৃতি-আলয়ে,
অচিরে যবন রাজ্য হইবে স্বপন।
পুনর্ব্বার যবনিকা উঠিবে যখন,
প্রবেশিবে অভিনব অভিনেতৃগণ।

১৭

"আজি উচ্ছ্বসিত মনে হ'তেছে স্মরণ,
অঙ্কে অঙ্কে এই দীর্ঘ অভিনয় কালে,
কত সুখ, কত দুঃখ কত উৎপীড়ন,
লিখিয়াছিলেন বিধি ভারত-কপালে !
দুঃখিনীর কত অশ্রু, হায় ! অনিবার
ঝরিয়াছে প্রিয়তম তনয়ের তরে ;

কত অত্যাচার, হায় ! কত অবিচার
সহিয়াছে অভাগিনী পাষাণ অন্তরে :
এখনো শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার,
করাল-কৃপাণ-মুখে ধর্ম্মের বিস্তার ।

১৮

কিন্তু বৃথা,—নাহি কাজ সুদীর্ঘ কথায় ।
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত ;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত ।
আছে,—কিন্তু হায় ! এই কলঙ্কসাগরে,
ছিল নাকি স্থানে স্থানে রতননিচয়
চিরোজ্জ্বল ! ইতিহাসে রক্ষিত আদরে ?
ছিল কি সম্রাট মাত্র সম নৃশংসয় ?
পাপী আরঙ্গজীব, আল্লাউদ্দিন পামর,
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর ?

১৯

"ঝোলে ব'লে দিবসের অঞ্চলে গোধূলি,
যতই তমসা ব'লে বোধ হয় মনে,
না থাকিলে রবি—বিশ্ব-নয়নপুতলী,—
দিবা ব'লে বোধ হ'ত নিশার তুলনে ।
স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমনি যবনরাজ্য—স্বজাতিপ্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্তু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হ'ত না কখন !
সন্দেহ, হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হ'ত চিত্রিত ।

২০

"কি কায সে সুখ দুঃখ করিয়া স্মরণ
ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা জাগায়ে আবার?
ক্রমে ওই নিশীথিনী-ছায়ার মতন,
যবনের হতভাগ্য হতেছে সঞ্চার!
আরঙ্গজীব অস্ত সনে, অলক্ষিতে হায়!
প্রবেশিল যে গোধূলি মোগল-সংসারে,—
উত্তরিল নিশা আজি; ঢাকিবে ত্বরায়
প্রকাণ্ড যবনরাজ্য নিবিড় আঁধারে।
দিল্লী, মুরশিদাবাদ, হইবে এখন
যবনের গৌরবের সমাধিভবন।

২১

"ছিল না ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের,—বীর-পরাক্রম
অস্তাচল হ'ত খ্যাত উদয়-অচলে।
সে বীরজাতির এই দৃঢ় সিংহাসন,
ছিল পঞ্চশত বর্ষ হিমাদ্রি মতন
অচল, অটল, রাজনৈতিক-সাগরে।
কে জানিত আজি তাহা হইবে পতন
বাঙ্গালীর মন্ত্রণায়, বণিকের করে?
কিংবা ভাগ্যদোষে যদি বিধি হয় বাম,
শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান।

২২

"পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি দুর্ব্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন;

তাহাদের সন্তান কি যত কুলাঙ্গার,
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন ?
ছিল সেই জাতি শ্রেষ্ঠ শৌর্য্য বীর্য্যে রত.
সদা তরবারি করে, সদা রণস্থলে ;
সেই জাতি এবে মগ্ন বিলাসে সতত ;
ঝুলিতেছে দিবানিশি রমণী-অঞ্চলে।
কিছুদিন পরে আর, — বিধির বিধান
ক্রীড়া পটে বিরাজিবে মোগল পাঠান !

২৩

"অথবা অভাগাদেরে দোষী অকারণ ;
দোষী বিধি, দোষী মন্দভাগিনী ভারত।
চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখন
হইবে না, চিরস্থির নক্ষত্র যেমত।
না জানি কি গুপ্ত বিষ ভারত-সলিলে
ভাসে সদা, বহে স্নিগ্ধ মলয় পবনে ;
তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পশিলে,
কামিনী-কোমল হয় তার পরশনে ;
ইন্দ্রিয় লালসা বহে সবেগে ধমনী,
বীর্য্য হয় ভোগলিপ্সা, পুরুষ রমণী

২৪

"প্রবেশিলা যে বীরত্ব-স্রোত দুর্নিবার,
আর্য্যজাতি সনে এই ভারত ভিতরে,
কি যত্ন না ফলিয়াছে গর্ব্বেতে তাহার ?
তুচ্ছ এক কহিনুর, মুকুটে আদরে
পরিবে ইংলণ্ডেশ্বরী,—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন ! ভারত তোমার

কত শত কহিনুরে পূজেছে চরণ
আর্য্য মন-রত্নাকর দিয়ে উপহার !
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
ভাঙ্গে নাই রোমাণের গর্ব্বস্থ স্বপন।

২৫

"যেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন ;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর,
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধাবাহন ;
যাহাদের তীক্ষ্ণ শরে গগন ভেদিয়া,
কনকচম্পকরাশি করিল হরণ ;
যাহাদের গদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ-পথে সহস্র বারণ ;
যাহাদের কীর্ত্তিকথা অমৃত সমান ;
এখনো মানবজাতি সুখে করে পান ;

২৬

"হে বিধাতঃ ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি ?
কেন তাহাদের হ'ল এত অবনতি ?
যেই সিংহাসনে, বীর রাবণ-অরাতি
বিরাজিত, বিরাজিত কুরুকুলপতি,
—সংখ্যাতীত নরপতি-প্রণামে যাহার
চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত,—
কুরুক্ষেত্রজয়ী বীর, দয়ার আধার,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল বিরাজিত ;
বসিল,—লজ্জার কথা বলিব কেমনে—
যবনের ক্রীতদাস সেই সিংহাসনে !

২৭

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র-মেদিনী—
এই মহাবাক্য যার ইতিহাসগত ;
সেই জাতি এ ভারত করি পরাধীনী,
—পাণিপথে, আত্মদ্রোহী হ'ল আত্মহত।
সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে,
সোনার বাঙ্গালারাজ্য দিল বিসর্জ্জন
সূচ্যগ্র-মেদিনী স্থলে, অম্লান অন্তরে
সমগ্র ভারত, আহা! করি সমর্পণ
বিদেশীকে, আছে সুখে ; জানে ভবিষ্যত
এই অবনতি কোথা হবে পরিণত!

২৮

"পাণিপথে যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার ;
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার।
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ
করিল তিমিরাবৃত ভারত-গগন,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি-নিয়ম ;
কিংবা জলধরছায়া থাকে কতক্ষণ ;

২৯

"যে আশা ভারতবাসী বীরধর্ম্ম-সনে
পলাশির রণ-রক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,

কহিবে না, স্মরিবে না, ভাবিবে না মনে,
কল্পনে ! সে কথা মিছে কহ কি কারণ ?
থাকুক্ পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন ;
থাকুক্ শোণিতে সিক্ত হত যোদ্ধৃদল,
জগতের যুগান্তর অদ্ভুত কেমন
ঘটাইবে ইহাদের শোণিত তরল !
ক্ষত বক্ষে রক্তস্রোত ছুটিল তখন
সবেগে, মোহনলাল মুদিল নয়ন ।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চম সর্গ

—*—

শেষ আশা

১

মুরশিদাবাদে আজি আমোদ মোহিনী,
নাচিয়া বেড়ায় সুখে প্রতি ঘরে ঘরে ;
পরিয়াছে দীপমালা যামিনী কামিনী
ভাসিতেছে রাজধানী সঙ্গীত সাগরে।
অহিফেন-মুগ্ধ মিরজাফর পামর ;
ঢুলু ঢুলু করিতেছে আরক্ত লোচন ;
"উড়িষ্যা বেহার বঙ্গ ত্রিদেশ-ঈশ্বর"—
বলিয়া পলাশিজেতা করেছে বরণ।
লভেছে পাতিয়া সেই উর্ণনাভ ফাঁদ,
তীর্থযাত্রা উপদেশ ধূর্ত্ত উমিচাঁদ।

২

নিমীলিত নেত্রদ্বয় ; মুখশ্রী গম্ভীর ;
পড়েছে জলদছায়া চৌষট্টি কলায় ;
নিরখিতে যেই চন্দ্র নেত্র পদ্মিনীর
হ'ত উন্মীলিত, আজি রাহুগ্রস্ত হায় !
পরিধান পট্টবস্ত্র ; উত্তরীয় গলে ;
অশিবব্যঞ্জক শ্মশ্রু-আবৃত বদন—
দীর্ঘ কারাবাস হেতু ; তপস্যার ছলে
জানুপরে কর, করে অঙ্গুলি-সংযম।
এরূপে মুঙ্গের দুর্গে বসিয়া পূজায়,
কৃষ্ণনগরের পতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

এ নহে সামান্য পূজা, প্রাণদণ্ড তরে
প্রেরিয়াছে রাজ-আজ্ঞা সিরাজদ্দৌলায়
হতভাগ্য নরপতি পূজা শেষ করে,
সহিবেক রাজদণ্ড যমদণ্ড প্রায়।
যতক্ষণ পূজা হায়! ততক্ষণ প্রাণ
সেই হেতু নরপতি পূজায় মগন;
সেই ধ্যানে রাজর্ষির নাহি বাহ্যজ্ঞান;
ক্ষণে ক্ষণে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস পতন।
পবন স্বননে ত্রস্তে মেলিছে নয়ন,
মনে ভাবি ক্লাইবের সৈন্য-আগমন

৪

কল্পনে! মুরশিদাবাদে আইস ফিরিয়া
হেন উৎসবের দিনে ছাড়িয়া নগর,
কে যায় কোথায়? মঞ্জু নিকুঞ্জ ছাড়িয়া
কে প্রবেশে অন্ধকার কানন ভিতর?
উঠিছে আকাশপথে, নগর হইতে
যেই আলোকের জ্যোতিঃ তিমির উজলি,
বোধ হয় দিগ্‌দাহ, অথবা নিশীথে
জ্বলিতেছে দাবানলে দূর বনস্থলী।
উৎসবের কোলাহলে, দূরে হয় জ্ঞান,
আমোদকাননে যেন ছুটেছে তুফান।

৫

"পলাশির যুদ্ধ"—আজি সহস্র জিহ্বায়
ঘোষিতেছে জনরব প্রভঞ্জন-গতি;

"পলাশির যুদ্ধ"—আজি মর্ম্মরে পাতায়,
স্বনিতেছে সমীরণ, গায় ভাগীরথী।
"পলাশির যুদ্ধ"—শত সহস্র নয়ন
চিত্রিতেছে অশ্রুজলে সহস্র ধারায়;
"পলাশির যুদ্ধ"—কত প্রফুল্ল বদন
হাসিতেছে মনসুখে; লিখিছে ধাতায়
"পলাশির যুদ্ধ", ওই বসিয়া অম্বরে;
ভারত-অদৃষ্ট গ্রন্থে অমর অক্ষরে!

৬

স্থানে স্থানে সমবেত নাগরিকগণ
করিতেছে পলাশির যুদ্ধ আলোচনা;
তাহাদের মধ্যে সত্যপ্রিয় যত জন,
প্রশংসিছে ক্লাইবের বীর্য্য বীরপণা।
যাহাদের সমধিক কল্পনা প্রবল,
তাহাদের মতে কোনো মহামন্ত্রবলে
ক্লাইব বঙ্গীয় সেনা রণে হতবল
করিয়াছে, কোনো উপদেবতার ছলে।
মূর্খের কল্পনাস্রোত হলে উচ্ছ্বসিত,
যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাবিত।

৭

শুষ্ক উপনদীতেও বরিষার কালে
প্রভূত সলিল যথা হয় প্রবাহিত,
তেমতি উৎসবে এই পুরী-অন্তরালে
বীথিতেও জনস্রোত আজি সঞ্চারিত।
অভিষেক উপলক্ষে মিরজাফরের,
সুসজ্জিত রাজহর্ম্ম্য, অবারিত দ্বার।

রাজপ্রাসাদের সজ্জা, নর নবাবের
নূতন সভার শোভা,—আমোদভাণ্ডার !
দেখিতে শুনিতে ওই দর্শক অশেষ
দীর্ঘ স্রোতে রাজদ্বারে করিছে প্রবেশ।

৮

সম্মুখে বিচিত্র সভা আলোক খচিত,
অমরাবতীর শোভা সৌরভে পূরিত।
বিগত বিপ্লবে হায় ! করেনি কিঞ্চিৎ
রূপান্তর,—সেই রূপ আছে সুসজ্জিত।
সেই রঙ্গভূমি, সেই আলোকের হার,
সেই সজ্জা, সেই শোভা, সেই সভ্যগণ ;
সেই বিলাসিনীবৃন্দ করিছে বিহার,
সেই রাজছত্রদণ্ড, সেই সিংহাসন।
সেই নৃত্য, সেই গীত, রয়েছে সকল ;
হায় ! সে সিরাজদ্দৌলা নাহি কি কেবল !

৯

মিরজাফরের আজি সার্থক জীবন ;
ভূতলে যুনানী স্বর্গ আজি অনুভব।
যেই সিংহাসনছায়া আঁধারে তখন
ছিল লুকাইয়া, আজি—হায় ! অসম্ভব—
সেই মিরজাফরের সেই সিংহাসন !
স্তাবকে বেষ্টিত হয়ে ব'সে সভাতলে,
অহিফেনে সঙ্কুচিত যুগলনয়ন ;
হৃদয় করিছে স্ফীত চাটুকার দলে।
প্রাচীন-বয়সে শ্লথ শ্রবণবিবরে,
ঢালিছে কোকিলকণ্ঠা কামিনী কুহরে

১০

বিমল সঙ্গীত-সুধা ; নাচিছে আবার
সঙ্গীতের তালে তালে ওই বিনোদিনী,
নাচে যথা, শুনি প্রাতে কোকিলঝঙ্কার,
কাননে গোলাপ, কিংবা সলিলে নলিনী।
তাম্বুলে রঞ্জিত রক্ত অধরযুগলে
ভাসিছে মোহিনী হাসি ; এই হাসি হায় !
—রে মিরজাফর মত্ত কামিনীকৌশলে !—
ভুষিয়াছে রাজ্যচুত সিরাজদ্দৌলায়।
তুমি রাজ্যভ্রষ্ট পুনঃ হইবে যখন,
তব শত্রু অভিষেকে হাসিবে তেমন।

১১

সেই নৃত্যগীতে মিরজাফরের মন
নহে মুগ্ধ ; নহে মুগ্ধ হাসিতে বামার ;
স্তাবকের স্তুতিবাদে হইয়া মগন,
তোষামোদপারাবারে দিতেছে সাঁতার।
কথা—পলাশির যুদ্ধ ; স্তাবকসকলে
বর্ণিছে কেমনে রণে নব বঙ্গেশ্বর
লভিয়াছে সিংহাসন বলে ও কৌশলে।
ইহাদের স্তুতি হলে সত্যের আকর,
ইতিহাসে ক্লাইবের হইত নিশ্চয়,
মিরজাফরের সনে স্থানবিনিময় !

১২

স্তাবকের স্তুতিবাদে, রে মূর্খ যবন !
যত ইচ্ছা স্ফীত কেন কর না হৃদয়,

সঙ্গীতের তালে ওই নর্ত্তকী যেমন
নাচিতেছে, সেইরূপ তুমিও নিশ্চয়
নাচিবে দুদিন পরে ইংরাজ ইঙ্গিতে।
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূর্খ! জান নাই আর,
সমুদ্রে ঝটিকাগ্রস্ত তরণী হইতে
অনিশ্চিত সমধিক অদৃষ্ট তোমার।
ইংরাজবণিক্ করে, জাননি এখন,
পণ্যদ্রব্য হবে এই বঙ্গ-সিংহাসন

১৩

সুসজ্জিত, সুবাসিত, রম্য হর্ম্ম্যান্তরে,
বিরাজিছে মনসুখে কুমার "মিরণ";
একে সুরা, তাহে সুধা, রমণী-অধরে,
অনল-সহায় যেন প্রবল পবন।
নিকটে বসিয়া নীচ উপাসক যত,
বর্ণিছে সুবর্ণ বর্ণে মিরণ নয়নে
নন্দনকানন-শোভা-পূর্ণ ভবিষ্যত।
মিরণ বসিবে যবে বঙ্গ-সিংহাসনে,
পাপিষ্ঠ ভাবিতেছিল, স্বহস্তে তখন
কত শত মানবের বধিবে জীবন।

১৪

এমন সময়ে এক পাপ অনুচর,
—লেখা যেন 'নরহন্তা' কপালে তাহার,
পাপে লৌহবর্ম্মাবৃত পাষাণ-অন্তর,
দুষ্প্রবৃত্তি নিবন্ধন বিকৃত আকার,
নিবেদিল আভূতল নত করি শির,
যোড় করে,—"যুবরাজ! এই অনুচর

হতভাগ্য নবাবের যত মহিষীর
শুনেছে রোদনধ্বনি, চিত্তদ্রবকর।
জাহ্নবী-তিমির-গর্ভ-খনির ভিতরে
রমণী-রতনরাশি”—বাক্য নাহি সরে।

১৫

দাঁড়াইল অনুচর স্তম্ভিত অন্তরে,
যেন কেহ অকস্মাৎ গ্রীবা নিষ্পীড়নে
করিয়াছে কণ্ঠরোধ। মুহূর্ত্তেক পরে,—
“যুবরাজ হায়! এই উদর কারণে
কত হত্যা কত পাপ করেছি সাধন,
কিন্তু এই শেষ”—চর নীরব আবার—
“অন্ধকারে বিদারিয়া জাহ্নবী-জীবন
করুণ মুমূর্ষু যেই নারী-হাহাকার
উঠিল আকাশপথে,—জীবনে, মরণে,
নিরন্তর সেই ধ্বনি বাজিবে শ্রবণে।

১৬

“বলিল সে ধ্বনি যেন নিয়তিবচন—
বিনা দোষে ডুবাইল যত অবলারে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মিরণ।”
নারীহন্তা পাপিষ্ঠের এই সমাচারে,
একটি বিদ্যুৎজ্যোতিঃ মিরণ-শরীরে
আপাদমস্তক যেন হ’ল সঞ্চালিত;
স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া প্রাচীরে;
মাদকে অবশ দেহ হইল কম্পিত।
ইংরাজের বীরকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া,
হেন কালে “হিপ্ হিপ হুর রে!” বলিয়া

১৭

ইংরাজ-শিবির-শ্রেণী, অদূর উদ্যানে,
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে নৈশ অন্ধকারে,
শোভিছে নক্ষত্র যথা নিদাঘ বিমানে,
শোভিছে আলোকরাশি উদ্যান আঁধারে।
শূন্য করি বাঙ্গালার রাজ্যের ভাণ্ডার,
বহুমূল্য রাশিকৃত সঞ্চিত রতন,
খুলিয়াছে বিজেতার আমোদ-বাজার,
সুখের সাগরে চিত্ত হয়েছে মগন।
এইরূপে বিজেতার করে কতবার
হইয়াছে বিলুণ্ঠিত ভারত-ভাণ্ডার!

১৮

হায়! মা ভারতভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
পরাণে বধিতে হায়। মধুমক্ষিকারে?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার;
স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
হইতে না রঙ্গভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার।
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ
হতে যদি, তবে মাতঃ! তোমার সন্তান

১৯

হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার।

ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
রক্তস্রোত ; হ'ত বক্ষ বীর্য্যের আধার।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
সজীব-পুরুষ-রত্নে ; দিগ্ দিগন্তর
ভারত-গৌরব-সূর্য্য হ'ত বিভাসিত ;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অন্যতর।
কল্পনে ! সে দুরাশায় কায নাই আর,
বৃটিশ শিবির ওই সম্মুখে তোমার !

২০

একটি শিবির মধ্যে টেবিল বেষ্টিয়া
বিরাজিছে কাষ্ঠাসনে যুবা কত জন ;
যেই বীর্য্য আসিয়াছে পলাশি জিনিয়া,
সুরাহস্তে পরাজিত হয়েছে এখন।
ভগ্ন কাচপাত্র, শূন্য সুরার বোতল,
যায় গড়াগড়ি পাশে। তা সবার সনে
কত বীরবর হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
বিস্মৃতির ক্রোড়ে ন্যস্ত ভূতল-শয়নে !
ত্রিভঙ্গ করিয়া অঙ্গ কেহ বা উঠিতে,
সুরার লহরী পুনঃ ফেলিছে ভূমিতে।

২১

শ্রেণীবদ্ধ কাচপাত্র টেবিল উপরে
বিরাজিছে—শূন্য কিংবা অর্দ্ধশূন্য সব !
এই পূর্ণ করিতেছে বোতল-নির্ঝরে ;
মধুর নিক্কণে এই—সুমধুর রব !—
প্রণয়মিলনে সবে চুম্বি পরস্পরে
উঠিল, হইয়া শূন্য যেন ইন্দ্রজালে,

উত্তরিল বজ্রনাদে টেবিল উপরে।
সুরাসঙ্কোচিত রক্ত নেত্র হেন কালে,
মদিরামার্জ্জিত কণ্ঠে সৈনিক-সকল,
আরম্ভিল উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত সরল।

২২

গীত

১

এ সুখের দিনে প্রফুল্ল অন্তরে
গাও মিলি সবে বৃটেনের জয়!
বীরপ্রসবিনী পৃথিবী ভিতরে,
ভূতলে অজেয় বৃটনতনয়!
বৃটনের কীর্ত্তি করিতে প্রচার,
পিয়ে এই গ্লাস, অমৃত-আসার,
গাও সবে মিলি, গাও তিনবার,—

হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ্—হুর রে!
হিপ্—হিপ—হুর রে!

২

ভূপতির শ্রেষ্ঠ বৃটন-ঈশ্বর;
সমুদ্র রাজ্যের পরিখা যাঁহার;
জিনিয়া অনন্ত অসীম সাগর,
দ্বিতীয় জর্জের মহিমা অপার।
দীর্ঘজীবী তাঁরে করুন ঈশ্বরে!

পান কর সবে এ কামনা করে ;
গাও তিন বার প্রফুল্ল অন্তরে,—
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুরে রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !

৩

জিনিয়াছি সবে যেই সিংহবলে,
পলাশির রণ হাসিতে হাসিতে ;
গাও জয় তাঁর,—ধ্বনি কুতূহলে
উঠুক আকাশে ভূতল হইতে !
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আরবার !
সুদীর্ঘ জীবন হউক তাঁহার !
পান কর সুখে ! গাও তিন বার,-
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !
হিপ্—হিপ্—হুর রে !

৪

ডুব ডুব করি ঢাল এই বার,
এবার অনূঢ়া বৃটিশ-ললনা !
স্মরি শ্বেতবক্ষঃ, হিমানী আকার,
রক্ত-ওষ্ঠাধরা, শ্বেতবরাননা,
স্মরিয়া নয়ন বিলাস-আধার,
শূন্য কর সবে গ্লাস এই বার,
গাও উচ্চৈঃস্বরে, গাও তিন বার—

হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রে !
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রে !
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রে !

২৩

নীরব নিশীথে এই আনন্দের ধ্বনি
উঠিল গগনপথে ; নৈশ সমীরণে
ভাসিল সে ধ্বনি ; ক্রমে হ'ল প্রতিধ্বনি
উদ্যান-অদূরস্থিত ইষ্টকভবনে।
সমীপ পাদপে সুপ্ত বিহঙ্গনিচয়
জাগিল সে ভীমনাদে কলরব করি ;
জাগিল গৃহস্থগণ হইয়া সভয়,
তস্করের সিংহনাদ মনে স্থির করি।
প্রবেশিল এই ধ্বনি মিরণ-শ্রবণে
সভাতলে। কারাগারে একটি রমণী

২৪

চিন্তা-অভিভূত তন্দ্রা ভাঙ্গিলে, অমনি
জাগিল সত্রাসে বামা ; সিরাজদ্দৌলার
শিবির-সঙ্গিনী হায় ! সেই বিষাদিনী !
বিষাদ-জলদে আরও গাঢ়তা সঞ্চার
হইয়াছে রমণীর ; অশ্রু বরিষণে
লিখেছে যুগলরেখা কপোল কমলে।
নাহি সে বিলাসজ্যোতিঃ যুগল নয়নে ;
পশিয়াছে কীট ওষ্ঠ বাঁধুলীর দলে।
সে নয়ন, সে বরণ, অতুল বদন,
ছায়ামাত্রে পরিণত হয়েছে এখন !

২৫

সুকুমার দেহলতা কোমলতাময়
চিন্তার তরঙ্গোপরি ভাসি বহুক্ষণ
না নিদ্রিত, না জাগ্রত, অবশ হৃদয়,
পড়েছিল ধরাতলে অবসন্ন মন।
বিজাতীয় গীতধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
দাঁড়াইয়া তীরবৎ কাঁপিতে লাগিল ;
আপন সর্ব্বস্ব ধন করিতে হরণ
আসিতেছে দস্যুবৃন্দ মনেতে ভাবিল !
সঙ্গীতের ধ্বনি মনে সিংহনাদ গণি,
ভূতলে মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়িল রমণী !

২৬

কিছুক্ষণ পরে বামা হয়ে সচেতন,
ভাবিতে লাগিল, —"আহা ! প্রাণেশে আমার
নিশ্চয় এসেছে দস্যু করিতে নিধন ;
জন্মের মতন নাথে দেখি একবার,"----
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে উন্মাদিনী প্রায়।
অবরুদ্ধ কক্ষ হ'তে হইতে নির্গত,
অমনি কপালে দৃঢ় কপাটের ঘায়
পড়িল ভূতলে স্বর্গ-প্রতিমার মত।
ছুটিল শোণিতস্রোত তিতিয়া কপাল,
ভাসিল লোহিত জলে সোণার মৃণাল !

২৭

হায় রে অদৃষ্ট ! যেই রমণী-শরীর
সুকুমার-শয্যা-গর্ভে হইয়া শায়িত

হইত ব্যথিত ; এ কি নির্ব্বন্ধ বিধির,
ইষ্টক-উপরে ওই আছে নিপতিত !
পিপীলিকা-দন্তাঘাতে, বেষ্টিয়া যাহারে
শুশ্রূষা করিত শত পরিচারিকায় ;
আজি সে যে নিদারুণ লোহার প্রহারে
মূর্চ্ছাপন্ন একাকিনী ইষ্টক-শয্যায় ।
রাজরাণী পড়ে হায় ! ভিখারিণী মত,
সোণার কমল, আহা, এইরূপে ক্ষত !

২৮

যায় নাই প্রাণ,—প্রাণ যাইবে বা কেন ?
এত সুকুমার নহে দুঃখের জীবন ?
দুঃখীর মরণ হলে স্বল্পে সিদ্ধ হেন,
ধরার অর্দ্ধেক দুঃখ হইত স্বপন ।
যায় নাই প্রাণ ;—বামা কিছুক্ষণ পরে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি জাগিল আবার ।
লোহাঘাত, রক্তপাত, পড়িয়া প্রস্তরে —
নাহি কিছু জ্ঞান ; কিসে প্রাণেশে উদ্ধার
করিবে ভাবিছে মনে ; কিসে একবার
লইবে হৃদয়ে সেই প্রেম-পারাবার ।

২৯

"হে বিধাতঃ !"—শোকে সতী নিবিড় আঁধারে
বলিতে লাগিল ধীরে করি যোড়কর,
চাহি ঊর্দ্ধ পানে, ভাসি নয়ন-আসারে,
অশ্রু সহ রক্তবিন্দু ঝরে দরদর্ ;—
"হে বিধাতঃ ! দুঃখিনীরে এবে দয়া কর,
আর এ যাতনা নাহি সহে নারীপ্রাণ,

জানি আমি পতি মম নৃশংস পামর,
হৃদয় পাষাণ তাঁর ; কিন্তু সে পাষাণ
দুঃখিনীরে বাসে ভাল ; দুঃখিনী তেমন
করিয়াছে সে পাষাণে আত্ম-সমর্পণ

৩০

"কহ কোন মন্ত্র, বিধি, দুঃখিনীর কাণে,
যার বলে ওই রুদ্ধ কপাট-অর্গল
খুলিবে পরশে মম, যেমতি বিমানে
খোলে পরশনে উষা-কর সুকোমল,
ধীরে পূর্ব্বাশার দ্বার নীরবে প্রভাতে !
অথবা যে বিধি হায় ! নিঠুর এমন,
দিয়া রাজ্য সিংহাসন বিপক্ষের হাতে,
বঙ্গেশ্বরে কারাগারে করিল প্রেরণ,—
নরহন্তা-হস্তে,—মরি, বুক ফেটে যায়,
সে বিধির কাছে কাঁদি কি হইবে হায় !

৩১

"সতী নারী আমি, মম পতিগত প্রাণ,
অবশ্য খুলিবে দ্বার পরশে আমার !
পবিত্র-প্রণয়-পথে হয় তিরোধান
পর্ব্বত, সমুদ্র, বন ; তুলনায় তার
তুচ্ছ ওই ক্ষুদ্র দ্বার"—বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বার করে সুকুমার,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে পিঞ্জর লোহার।
রমণীর কর-রক্তে দ্বার কলঙ্কিল,
রমণীর কত অশ্রু কপাটে ঝরিল।

৩২

"রে পাপিষ্ঠ নরাধম নৃশংস মিরণ !
হরি রাজ্য সিংহাসন, ওরে দুরাচার !
তোর পাপতৃষা কি রে হ'ল না পূরণ ?
রমণীর প্রতি শেষে এই অত্যাচার !
বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ এই কারাগারে,
লইব পাতিয়া বুকে উলঙ্গ কৃপাণ,
তথাপি এ রমণীর প্রেমপারাবারে
বিন্দুমাত্র বারি তোরে করিবে না দান।
যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী-প্রণয়,
অনলে সে চাহে জল, পাষাণে হৃদয়।"

৩৩

লোহার কবাট, দৃঢ় লোহার অর্গল,
খুলিল না রমণীর করুণ রোদনে,
দ্রবিল না দুঃখিনীর ঝরি অশ্রুজল।
বৃথাশ্রমে বিষাদিনী অবসন্ন মনে
বসিল ভূতলে ; আহা ! শিথিল শরীর,
আশ্রয়বিহীন চারু লতার মতন,
পড়িল ভূতলে ক্রমে হইয়া অধীর।
রক্তস্রোতে শোকস্রোতে হ'য়ে অচেতন,
মৃত্যুর অশোক অঙ্কে করিল শয়ন।

৩৪

নীরব অবনী ; নিশি দ্বিতীয় প্রহরে ;
নীরব নিদ্রিত পুরী ; আমোদ-তুফান
বিলোড়ন করি পুরী এবে স্থিরতর ;
হয়েছে নগর যেন অবসন্নপ্রাণ।

প্রহরীর পদশব্দ ; ঝিল্লির ঝঙ্কার ;
পবনে শঙ্কিত দূর সারমেয় রব ;
কেবল মধুর স্বনে সমীর-সঞ্চার
কারা-বাতায়নে ;—আর সকলি নীরব।
কেবল রমণী শোকে নীরবে রজনী
বর্ষিতেছে শিশিরাশ্রু তিতিয়া অবনী।

৩৫

কারাগার-কক্ষান্তরে গভীর নিশীথে,
কে ও দাঁড়াইয়া ওই অবনত মুখে ?
বাতায়ন-কাষ্ঠে বক্ষ, নেত্র পৃথিবীতে,
শ্মশ্রু বহি অশ্রুধারা পড়িতেছে বুকে
কেবল অভাগা হায় ! একতান মন,
শুনিয়াছে রমণীর শোক উদ্বেলিত ;
করিয়াছে প্রতিপদে অশ্রু বরিষণ ;
প্রতিতানে হইয়াছে চিত্ত বিদারিত।
যেন পদে পদে ক্রমে আয়ু হ'য়ে ক্ষয়,
শেষ তানে জীবনের হইয়াছে লয়।

৩৬

প্রস্তর-পুতুল যেন গবাক্ষে স্থাপিত,
হতভাগা দাঁড়াইয়া রয়েছে এখন
অস্পন্দ শরীর, সর্ব্ব ধমনী স্তম্ভিত,
অনিশ্বাস, অপলক, নাসিকা, নয়ন।
তুমুল-ঝটিকা-বেগে কিন্তু স্মৃতিপথে,
বহিতেছে জীবনের ঘটনানিচয় ;
সুখের শৈশবকাল, কৈশোরস্বরতে,
বঙ্গসিংহাসন, ঘোর অত্যাচারচয়,

প্রজার বিরাগ, পরে পলাশিসমর,
পরাজয় পলায়ন, ধৃত, কারাঘর,

৩৭

অবশেষে প্রিয়তম-পত্নী-কারাবাস,—
একে একে সব মনে হইল উদিত।
শেষ চিন্তা,—দাবানলে ছুটিল বাতাস,—
অবসন্ন দেহ, শির হইল ঘূর্ণিত।
সহিতে না পারি যেন এই গুরু ভার
ভূতলে পতিত হ'ল শ্লথ-কলেবর ;—
কমলিনীদলনিভ শয্যায় যাহার
সতত শয়ন তার শয্যা কি প্রস্তর !
অবিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি নয়নে তাহার
ঘোরতর কুজ্ঝাটিকা করিল সঞ্চার।

৩৮

কুজ্ঝাটিকা ব্যাপ্ত সেই তমিস্র ভিতরে,
নিরখিল হতভাগ্য মানস-নয়নে,
ভীষণ উন্মত্ত নীল বহ্নির সাগরে
প্রচণ্ড তরঙ্গরাশি ভীম আবর্ত্তনে
গর্জ্জিছে জীমূত-নাদে ; নাহি বেলাসমা,
ছুটিছে অনল-ঊর্ম্মি দিগন্ত ব্যাপিয়া ;
অতি ভয়ঙ্কর সেই অনল-নীলিমা !
সে নীল তরল বহ্নিসাগরে ভাসিয়া
অসংখ্য মানববৃন্দ ; দগ্ধ কলেবর,
অনন্ত কালের তরে দহে নিরন্তর।

৩৯

এই দগ্ধ দেহে তপ্ত তরঙ্গ-প্রহারে,
অস্থি হ'তে মাংসরাশি ফেলিছে খুলিয়া ;
উলঙ্গ করঙ্কে পুনঃ প্রচণ্ড হুঙ্কারে,
দিতেছে স্খলিত মাংস সংলগ্ন করিয়া।
হায় ! কিবা চিন্তাতীত দারুণ পীড়ায়
করিতেছে দগ্ধ দেহ ভীষণ চীৎকার !
এই দৃশ্যে, হাহাকারে, অনল-শিখায়,
কেশরাশিতেও কম্প হ'ল অভাগার।
অকস্মাৎ হতভাগ্য দেখিল তখন,
এ অনল-পারাবারে হয়েছে পতন।

৪০

কি যন্ত্রণা নিদারুণ করঙ্ক ভিতর
দংশিতেছে বজ্রদন্তে কীট সংখ্যাতীত
হুঙ্কারিয়া চতুর্দ্দিক্ নীল বৈশ্বানর,
অভাগারে একেবারে করিল গ্রাসিত।
সাঁতারিতে চাহে, কিন্তু দগ্ধ দুই করে
শিলাবৎ অবশতা হয়েছে সঞ্চার,—
যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা ! কম্পিত অন্তরে
উঠিল অভাগা ঘোর করিয়া চীৎকার।
কক্ষে আলো, অসি করে সম্মুখে শমন,
চীৎকার করিয়া ভূমে হইল পতন !

৪১

এই কি সিরাজদ্দৌলা ? এই সে নবাব
যার নামে বঙ্গবাসী কাঁপে থর থর ?

যার এই বঙ্গে ছিল প্রচণ্ড প্রভাব,
সেই কি পতিত আজি ধরার উপর ?
কোথায় সে সিংহাসন ? পারিষদগণ ?
কোথায় সিরাজ তব মন্ত্রিমণ্ডল ?
কোথায় সে রাজদণ্ড ? খচিত ভূষণ ?
কেন আজি অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল ?
এ যে মহম্মদিবেগ তব অনুচর,
তুমি কেন প'ড়ে তার চরণ উপর ?

৪২

দুই দিন আগে এই দুর্দ্দান্ত সিরাজ,
চাহিত না মুখ তুলি যেই অনুচরে ;
আজি সে নবাব আহা ! বিধির কি কায !—
কাঁদিছে চরণে তার জীবনের তরে।
শত নরপতি পড়ি যাহার চরণে
কাঁদিত,—অদৃষ্ট আহা কে দেখে কখন !
সে মাগিছে ক্ষমা ; যাহা এ পাপ জীবনে
জানে নাই, শিখে নাই, ভ্রমে বিতরণ
করে নাই। কি আশ্চর্য্য বিধির বিধান !
যাহার যেমন দান, তথা প্রতিদান !

৪৩

রে পাপিষ্ঠ, দুরাচার, নিষ্ঠুর, দুর্জ্জন !
পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল।
কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ বপন,
ফলিবে তেমন তরু, অনুরূপ ফল।
আজন্ম ইন্দ্রিয়-সুখ পাপের মায়ায়,
কি পাপে না বঙ্গভূমি করেছ দূষিত ?

নরনারী-রক্তস্রোতে, ভুলেছ কি হায় !
কি পাপকামনা নাহি করেছ পূরিত ?
ভাবিতে পরের ভাগ্য-বিধাতা তোমায় ;
নিজ ভাগ্যে এই ছিল জানিতে না হায় !

৪৪

রে নির্দ্দয় অনুচর, কৃতঘ্ন-হৃদয় !
কি কাযে উদ্যত আজি নাহি কি রে জ্ঞান ?
কেমনে রে দুরাচার ! কেমনে নির্ভয়ে,
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ ?
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আপনার পাপে
ডুবিতেছে যেই পাপী, কি কাজ তাহারে
বধিয়া আবার ? আহা নিজ অনুতাপে
জ্বলিতেছে যেই জন, অকারণ তারে
কি ফল বল না প্রাণে করিয়া সংহার ?
মরার উপরে কেন খাঁড়ার প্রহার ?

৪৫

ডুবিছে, ডুবিছে পাপী আপনি আপন ;
শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কায তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর ?
সৌভাগ্য-আকাশ-চ্যুত অভাগা যবন
ভূতলে পতিত এবে নক্ষত্রের প্রায় ;
কি হইবে অভাগার বধিলে জীবন ?
থাক্ হত গৌরবের পতাকার ন্যায় ।
হারাইয়া ধন, মান, রাজ্য, সিংহাসন,
কারাগারে হতভাগ্য কাটাক্ জীবন !

৪৬

গভীর নিশীথ ; নৈশ প্রকৃতি গভীর ;
স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব চরাচর ;
কৃষ্ণপক্ষ রজনীর বরণ তিমির,
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গাঢ়তর।
মাতঃ বসুন্ধরে ! হেন নিবিড় নিশীথে
হিংস্র জন্তুরাও বনে বিবরে নিদ্রিত ;
হায় ! এ সময়ে কেন ধরা কলঙ্কিতে,
মানবের পাপলিপ্সা হয় উত্তেজিত ?
বসুমতি ! বঙ্গভূমি ! যাও রসাতল !
লইও না এই পাপ পাতি বক্ষঃস্থল !

৪৭

কি করিস্ ! কি করিস্ ! ওরে অনুচর !
তুলিস্ না তীক্ষ্ণ অসি, ওরে নৃশংসয় !
ক্ষমা কর্ ! ক্ষমা কর্ ! অনুরোধ ধর্ !
এই পাপে যবনের ঘটিবে নিরয় !
উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝল্‌মল্,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে ; নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ-আশা,—হইল স্বপন !

সম্পূর্ণম্ ।

পরিশিষ্ট

—*—

ক—১ম সর্গ ২৫ শ্লোক—

১৮৬৯ ইংরাজির কোন এক সংখ্যক অমৃতবাজার পত্রিকাতে "সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব গেল কেন ?" শীর্ষক যে একটি প্রস্তাব প্রকটিত হয় তাহা হইতে এই ঘটনানিচয় গৃহীত হইল।

খ—২য় সর্গ ২৭ শ্লোক—

মান্দ্রাজে এক দুরন্ত সৈনিককে ক্লাইব 'ডুয়েল' যুদ্ধে হত করেন। এই ঘটনা মেকলিতে বিস্তার বর্ণিত আছে।

গ—৫ম সর্গ ৩য় শ্লোক—

আমি কোন একজন বঙ্গ-সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে মুঙ্গের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এবং যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমতিও প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ ইষ্টদেবতার পূজা সাঙ্গ করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে অবকাশ লইয়া, এত দীর্ঘ পূজা আরম্ভ করেন যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং ক্লাইবের দূত যাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করে। তদবস্থিত মহারাজের একখানি চিত্রপট অদ্যাপি কৃষ্ণনগররাজভবনে আছে বলিয়া বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন।

ঘ—৫ম সর্গ ১৬ শ্লোক—

যশোহর অবস্থিতি কালে কোন একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, মিরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তৎপুত্র পাপিষ্ঠ মিরণ দ্বেষ-পরবশ হইয়া সিরাজদ্দৌলার পত্নীবৃন্দকে একখানি তরণীসহ ভাগীরথীগর্ভে

মগ্ন করে। হতভাগিনীগণ নিমজ্জিত হইবার সময়ে মিরণকে তিনটি অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল ;—প্রথমটি, মিরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে ; দ্বিতীয়টি, মিরজাফর অচিরে সিংহাসনচ্যুত হইবে ; তৃতীয়টি আমার স্মরণ হইতেছে না। এই গল্পটি সত্য কি মিথ্যা তাহা রচয়িতা বলিতে পারেন না ; তাহা কাব্যলেখকের জানিবারও আবশ্যক করে না কারণ তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক।

—

দ্বিতীয় খণ্ড

কাব্য-আলোচনা

" 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়িয়া আমার ধারণা হয়, কবি বাঙালীর হৃদয়ে গভীর ভাব জাগরিত করিবার জন্যই ঐ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার আদরের মাতৃভূমির জন্য যে ভাবনা করিয়াছিলেন, যে ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, পলাশীর যুদ্ধের প্রতি পত্রে ছত্রে ছত্রে সে গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক বাঙালীকে তাহা অনুভব করাইয়া গিয়াছে এ বিষয়ে বাঙালী তাঁহার নিকট চিরঋণী।"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

কাব্য-আলোচনা

১। কবি-পরিচয়

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের অমর কবি নবীনচন্দ্র সেন পরিবর্তন-যুগের প্রথম ভাগের অন্যতম কবি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—প্রধানতঃ এই তিনজনই শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম কবি এবং উনবিংশ শতকের সাহিত্যের আসরে প্রায় এক সময়েই ইঁহারা আবির্ভূত হন। প্রথমে মধুসূদন ও পরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের আবির্ভাবে বাংলা কাব্যসাহিত্য বেশ ভাল করিয়াই আধুনিকতায় দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর বাংলা কাব্যসাহিত্যের স্রোত এক সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

কবির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার কাব্যে, তাঁহার রচনায়। বিশেষ একখানি গ্রন্থের জন্যই কবি বিশেষভাবে পরিচিত হন। সেই বিশেষ গ্রন্থের সঙ্গে কবির নাম এবং কবির নামের সঙ্গে গ্রন্থের নাম পাঠকচিত্তে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠে। যেমন মাইকেলের নাম করিলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' মনে পড়ে ; হেমচন্দ্রের নামে 'বৃত্রসংহার', তেমনি 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের কথা উঠিলেই তখনই মনে পড়িয়া যায় এ কাব্যের স্রষ্টা হইতেছেন বাংলার আধুনিক সাহিত্যের প্রথম যুগের অন্যতম কবি, নবীনচন্দ্র সেন। আবার কথায় কথায় কবি নবীনচন্দ্রের কথা উঠিলেই মনে হয়, বিখ্যাত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের কবি ইনি। বস্তুতঃ, 'পলাশির যুদ্ধ' নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তি না হইলেও, তাঁহার কবিখ্যাতি এই কাব্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

নবীনচন্দ্র ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের (মতান্তরে ১৮৪৬) ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামের বিখ্যাত রায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে স্বীয় আত্মজীবনীতে নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন : "শুভ জন্মপত্রিকায়

দেখিলাম—১৭৬৮ শকাব্দায় বুধবাসরে তমিস্রপক্ষে দশমী তিথিতে তৃতীয়-দণ্ড বেলার সময়ে বহুতর শুভযোগে আমার শুভ জন্ম। পিতা স্বর্গীয় গোপীমোহন রায়। মাতা স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরী। আমি জাতিতে বৈদ্য।” (আমার জীবন—১ম ভাগ)।

গোপীমোহন চট্টগ্রামের জজ-আদালতের অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী পেশকার ছিলেন এবং পরে মুন্সেফ হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের মাতা যেমন স্নেহময়ী তেমনি সরল প্রকৃতি ছিলেন। নয়াপাড়া গ্রামখানির চারিদিক হীরক হারের ন্যায় নদীর দ্বারা বেষ্টিত। পূর্বদিকে নদীর অপর পারে তরুলতা-শোভিত শ্যাম পর্বতমালা। যিনি আজীবন তাঁর সরিৎ-মালিনী শৈল কিরিটিনী চট্টলাকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনি শৈশবেই তাঁহার জন্মভূমি নয়াপাড়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন। প্রকৃতির সহিত নবীনচন্দ্রের তাই আশৈশব অন্তরঙ্গতা।

গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঁচ বৎসর বয়সে নবীনচন্দ্রের শিক্ষার আরম্ভ। আট বৎসর বয়সে তিনি চট্টগ্রাম শহরে পিতার নিকট আসেন। ছাত্রজীবনে নবীনচন্দ্র শান্তশিষ্ট ও সুবোধ ছেলে ছিলেন না। এত দুরন্ত ছিলেন যে, স্কুলে থাকিতেই ‘দুষ্টের শিরোমণি’ উপাধি পাইয়াছিলেন। এমন খেলা নাই খেলিতেন না, এমন অস্ত্র নাই চালাইতেন না, এমন লোক নাই খেপাইতেন না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সতেরো বৎসর বয়সে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। “প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইল। তাহাতে আমি বিস্মিত ; দেশশুদ্ধ লোক তটস্থ হইল। যে ছেলের জেঠামিতে এবং দুর্বৃত্তিতে একখানি নূতন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচিত হইতে পারিত, সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইল, কথাটি কেহ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না।” (আমার জীবন—১ম ভাগ)।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য নবীনচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে

পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ এবং জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে পরীক্ষা দিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাশ করেন।

কলিকাতায় অধ্যয়নকালে, ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিবার সময় নবীন্‌-চন্দ্রের বিবাহ হয়। "এফ. এ পরীক্ষার আর এক মাস মাত্র বাকী। আজ কলেজ সে জন্যে বন্ধ হইতেছে। বিদ্যুৎ দূত মুহূর্তে সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন, এবং প্রথম আঘাতে আমাকে বজ্রাহত করিলেন। "To be or not to be," এক দিকে পরীক্ষা, অন্য দিকে জীবনের সুখের তিতিক্ষা।......১৮৬৫ ইংরাজি নভেম্বর (কার্ত্তিক) মাসে আমার সংসার জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইল। আমার বয়স তখন ১৯, স্ত্রীর (লক্ষ্মীর) ১০। (আমার জীবন—১ম ভাগ)।

জীবনের প্রারম্ভেই দুর্ভাগ্যের সহিত নবীনচন্দ্রের পরিচয় হয়। বি.এ. পরীক্ষার যখন প্রায় তিন মাস বাকি, সেই সময় (১৮৬৭) নবীনচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হইল। গোপীমোহন অজস্র উপার্জন করিতেন, কিন্তু ব্যয়ও করিতেন তেমনি দুই হাতে। দানশীলতার জন্য তিনি বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাই মৃত্যুকালে গোপীমোহন পুত্রের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন ঋণের বোঝা ও একটি নিরাশ্রয় বৃহৎ পরিবার। রাজপুত্র পথের কাঙাল হইলেন। নবীনচন্দ্র শোকাশ্রু মুছিয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ 'পিতৃহীন যুবক' কবিতাটি এই সময় রচিত হয়।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর নবীনচন্দ্রকে কিরূপ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার মর্মস্পর্শী পরিচয় কবি নিজেই দিয়াছেন। "একটি কিশোরবয়স্ক কলিকাতার পথের কাঙাল কেমন করিয়া কূল পাইবে? সকল অবলম্বন ভাসিয়া গিয়াছে, সকল আশা নিবিয়া গিয়াছে। একমাত্র আশা সেই বিপদভঞ্জন হরি। ভক্তিভরে, অবসন্ন প্রাণে, কাতর অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি প্রহ্লাদের মত আমাকেও তাঁহার

নরমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। সেই নর-নারায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।…… পরদিন প্রাতে তাঁহারই শরণ লইতে চলিলাম। বলিলাম—আমি পিতৃহীন, ঘোরতর বিপদগ্রস্ত। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বিপদ কি ? আমি তখন ভগ্নকণ্ঠে আমার দুঃখের কাহিনী তাঁহার কাছে নিবেদন করিলাম। তিনি অধোমুখে নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কপোলযুগল বহিয়া ধীরে ধীরে গোমুখী হইতে সুরধুনীধারার মত দুটি সন্তাপহারিনী প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তুমি এখনও বালক, আর তোমার উপর এ বিপদ ! কিন্তু তুমি কাতর হইও না। আমিও একদিন তোমার মত দুঃখী ছিলাম। সংসারে দুঃখীই অধিক।……তোমার মাসিক খরচ কি লাগে ?" (আমার জীবন—১ম ভাগ)।

সেদিন এই বিদ্যাসাগর না থাকিলে নবীনচন্দ্রের কি হইত বলা যায় না। উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের দয়ার ঋণ স্মরণ করিয়া কবি তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য তাঁহাকে উৎসর্গ করেন এবং বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর "মানব-ঈশ্বর" শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতায় বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কবিতাটির এক স্থলে কবি লিখিয়াছেন :

"বিদ্যার সাগর তুমি
বিপ্লবের বেলাভূমি
সংসার মরুতে তুমি দয়ার সাগর—
দক্ষিণ করের দান,
কভু নাহি জানে বাম,
নিজে দীনহীন, পরদুঃখেতে কাতর।

গলদশ্রু দু'নয়নে
ভিক্ষা চাহি শ্রীচরণে
আশীর্ব্বাদ কর শিরে স্থাপিয়া চরণ ;

তোমার সাহিত্যে প্রাণ
তোমার আদর্শে ধ্যান
সমর্পিয়া, পূজি বঙ্গ-সাহিত্য ঈশ্বর—
বিশ্বের সাহিত্য বুঝি, পূজি বিশ্বেশ্বর।"

নবীনচন্দ্র পরীক্ষা দিয়া বেকার অবস্থায় কর্মের জন্য নানা স্থানে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিলেন। প্রাইভেট টিউসান করিয়া যাহা পাইতেন তাহা বাড়িতে পাঠাইতেন আর কলিকাতায় নিজের খরচের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে একমাসের জন্য হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। সেখানে তাঁহাকে সাহিত্য পড়াইতে হইত। দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল। নবীনচন্দ্র আবার বেকার হইলেন। কিন্তু কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাঁহাকে দমাইতে পারিল না; জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, লেঃ গবর্ণর গ্রে'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লেঃ গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট এক পত্র লিখিলেন। সেক্রেটারী তাঁহাকে দেখা করিবার অনুমতি দিলেন। কম্পিতবক্ষে নবীনচন্দ্র একদিন লাট-প্রাসাদে সেক্রেটারী স্টান্স্‌ফিল্ডের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সেক্রেটারীর হৃদয় বিগলিত হইল। শেষ পর্যন্ত স্টান্সফিল্ডের চেষ্টায় নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষার মনোনয়ন (nomination) পাইলেন। টাউন-হলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়। নবীনচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

এইবার শুরু হইল তাঁহার কর্মজীবন। দুঃস্থ ও বেকার জীবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য নবীনচন্দ্রের যে গভীর আত্মবিশ্বাস ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ছিল, তাহাই অবলম্বন পূর্বক তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে নবীনচন্দ্র সুদীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর কাল সরকারী কর্মে নিযুক্ত

থাকিয়া একদিকে যেমন বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, অন্যদিকে তেমনি বাংলার তৎকালীন বহু স্বনামধন্য লোকের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নানাস্থানেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'আমার জীবন' গ্রন্থে সবিস্তারে তাঁহার চাকুরী জীবনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের তেজস্বিতার জন্য এই ডেপুটি-জীবন তাঁহার পক্ষে পুষ্প-শয্যা হয় নাই। তিনি বিবেকশক্তির প্রতিকূলে কার্য করিতে অসম্মত হইয়া, পরোপকার করিতে গিয়া, সর্বশেষ, স্বদেশপ্রেমের জন্য বারংবার বিপদ্‌গ্রস্ত হন।

কবিতানুরাগ নবীনচন্দ্রের বংশগত। তাঁহার পিতা একজন সুকবি ছিলেন, পিতৃব্যেরাও যাত্রার পালা ও কবিতা রচনা ইত্যাদিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "পাখার যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ তেমনি আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।···আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হইতেই গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম।" (আমার জীবন—১ম ভাগ)।

কলিকাতায় আসিবার পরও তাঁহার কবিতা রচনা অব্যাহত ছিল। এই সময় ঘটনাক্রমে শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শিবনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তাঁহার আগ্রহে ও চেষ্টায় প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' (মার্চ ১৮৬৬, হইতে আগষ্ট ১৮৬৮ পর্যন্ত প্যারীচরণ ইহার সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক হন) নবীনচন্দ্রের লিখিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কবিতাটি প্রকাশিত হইলে পরে তিনি খোঁজ লইয়া জানিলেন কোন্ ছাত্রটি নবীনচন্দ্র এবং তখন তাহাকে বলিলেন, 'তোমার বেশ শক্তি

আছে। তুমি ইহার অনুশীলন কর। তুমি সর্বদা এডুকেশন গেজেটে লিখিবে।' নবীনচন্দ্রের বহু কবিতা "গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্যারীচরণের কাছে উৎসাহ পাইয়া নবীনচন্দ্র কবিতার অনুশীলনে কোনও দিনই ক্ষান্ত হন নাই। কর্মজীবনের প্রারম্ভে নবীনচন্দ্র যখন যশোহরে, তখন স্বনামখ্যাত দীনবন্ধু মিত্রও সেখানে বদলী হইয়া আসিলেন। এইখানে নবীনচন্দ্রের "পিতৃহীন যুবক" কবিতাটি শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এই প্রথম বয়স। কল্পনা যেন ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তুমি নিশ্চয়ই একজন বড় কবি হইবে।"

কবির প্রথম বয়সের অর্থাৎ আঠার হইতে তেইশ বৎসরের মধ্যে লিখিত কবিতাবলী একত্র করিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'অবকাশরঞ্জিনী' নাম দিয়া প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইংরেজ কবি বায়রনের 'Hours of Idleness'-এর অনুকরণে কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেন। স্বকীয় উপলব্ধির জারকরসে সিঞ্চিত করিয়া বিক্ষিপ্ত ক্ষণস্থায়ী ভাবমুহূর্ত-গুলিকে খণ্ড ও নাতিদীর্ঘ কবিতায় তিনি ইহাতে বিধৃত করিয়াছেন। কবিতাগুলির ব্যক্তিলীনতা ও স্বাভাবিক হৃদ্য সুর উপভোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রেসে ইহা ছাপিয়াছিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে লেখকের নাম ছিল না। "শ্রীনঃ" মাত্র ছিল। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন ইহা বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে নবীন কবির 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রথম স্বতন্ত্র সমালোচনার স্থান লাভ করে এবং সে সমালোচনা লিখিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। বঙ্গদর্শনের সমালোচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন তিনি সুকবি এবং বিশুদ্ধরুচি, তিনি যশস্বী হইবার যোগ্য। এই কবির বিশেষ গুণ এই যে চিত্তের যে সকল ভাব কোমল এবং স্নেহময়, তৎসমুদয় অপূর্ব্ব শক্তি সহকারে উদ্ধৃত করিতে পারেন। তাঁহার একটি ক্ষমতা যে তিনি শব্দ-চতুর।...কাব্যোপযোগী সামগ্রাগুলি আহরণ করিয়া

সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। ইনি মানস-প্রসূত কবিত্বরত্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে বিকীর্ণ করিয়াছেন।”

এইভাবে নবীনচন্দ্র তাঁহার কবি-জীবনের প্রারম্ভেই খ্যাতি লাভ করেন। ইহার পর ১৮৭৫ সালে কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘পলাশির যুদ্ধ’ কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নবীনচন্দ্র কবিযশ লাভ করেন এবং বহু বিখ্যাত হইয়া পড়েন। বান্ধব, বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, হিন্দু পেট্রিয়ট ও ক্যালকাটা রিভিয়্যু প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইংরেজি ও বাংলা সাময়িক পত্রিকায় ‘পলাশির যুদ্ধ’ সমালোচিত হয় এবং সকলেই একবাক্যে নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতি ও কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করেন। যে স্বদেশপ্রেম কলেজে পড়িবার সময় নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় এবং যশোহরে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সংস্পর্শে আসিয়া যাহা দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে, সেই স্বদেশপ্রেমকেই নবীনচন্দ্র ‘পলাশির যুদ্ধ’ কাব্যে রূপ দিয়াছিলেন। ‘পলাশির যুদ্ধ’ লিখিয়া নবীনচন্দ্র বাংলার ‘বায়রন’ বলিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

কবির আটত্রিশ বৎসর কাল ব্যাপী সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তিনি অনলসভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। ‘পলাশির যুদ্ধ’ ভিন্ন তিনি নয়খানি কাব্যগ্রন্থ, চণ্ডী ও গীতার পদ্যানুবাদ, ‘ভানুমতী’ নামে একখানি উপন্যাস, ও ‘আমার জীবন’ নামে সুবৃহৎ আত্মচরিত রচনা করেন। নয়খানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তিনখানি হইল জীবনী-কাব্য, যথা, খৃষ্ট, অমিতাভ (বুদ্ধলীলা) ও অমৃতাভ (চৈতন্যলীলা)। এই অমৃতাভই কবির শেষ রচনা এবং ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ১২শ সর্গ পর্যন্ত রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা প্রকাশিত হয়। অন্য ছয়খানির মধ্যে ত্রয়ীকাব্য হিসাবে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস নবীনচন্দ্রকে অক্ষয় কবি-যশ আনিয়া দিয়াছে। এই কাব্যত্রয়ই তাঁহার কীর্তিসৌধ।

প্রধানতঃ কাব্যরচনায় অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও, গদ্য রচনায় কবির দক্ষতা বড় অল্প ছিল না। তাঁহার অনতিদীর্ঘ আত্মজীবনী ‘আমার

জীবন'-এর অধিকাংশ স্থলে আত্মপ্রচার ও দম্ভ প্রকাশ পাইলেও উহার রচনারীতি আদ্যোপান্ত বড়ই স্বচ্ছন্দ। বর্ণনার মনোহারিত্বে, রসকৌতুকের উজ্জ্বলতায়, মানবচরিত্র বিশ্লেষণে ইহা উপন্যাসের সৌন্দর্য লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে কবি নবীনচন্দ্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। তাঁহার অন্য গদ্য রচনা, 'প্রবাসের পত্র', পত্রসাহিত্য হিসাবে উপভোগ্য ও মনোরম। ইহাতে কবি ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

এ ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত কবির নাম জড়িত আছে। বাংলা ১৩০১ সালে ১৭ই বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতেই নবীনচন্দ্র ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ইহার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং ১৩০১-০৩ সালে সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী পরিবর্তিত করিয়া উহাকে বিতর্ক সভা হইতে কার্যকরী সভায় পরিণত করিতে নবীনচন্দ্র বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের সম্পর্কেও আসিয়াছিলেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার তৎকালীন প্রবীন ও নবীন সকল সাহিত্যিকের সহিত নবীনচন্দ্রের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল।

১৯০৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী কবি চট্টগ্রামেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে তখনকার সাহিত্যের অন্যতম নায়ক সমাজপতি মহাশয় এক মর্মস্পর্শী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন: "কবিবর নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে উহার ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে। কিন্তু পলাশির যুদ্ধ কাব্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি দৃঢ় হউক আর নাই হউক, উহার কাব্যাংশের যাহা প্রাণ—তাহাতে তাহার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। 'পলাশির যুদ্ধ' পড়িয়া আমার ধারণা হয়, কবি বাঙালীর

হৃদয়ে গভীর ভাব জাগারিত করিবার জন্যই ঐ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার আদরের মাতৃভূমির জন্য যে ভাবনা করিয়াছিলেন, যে ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, 'পলাশির যুদ্ধের' প্রতি পত্রে ছত্রে ছত্রে সে গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাহা অনুভব করাইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে বাঙালী তাঁহার নিকট চিরঋণী।"

আমরাও বলি, বাঙালী নবীনচন্দ্রের নিকট চিরঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙালী এই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা অদ্যাবধি করে নাই; বরং মনে হয়, বাঙালী নবীনচন্দ্রকে ভুলিয়াই গিয়াছে। তাঁহার বড় কবি-প্রতিভা না থাকিতে পারে, কিন্তু হৃদয় তো ছিল। সেই হৃদয়ের মূল্য কি আমরা দিব না? তবে একথা ঠিক যে, 'পলাশির যুদ্ধের' কবিকে বাঙালী সহজে ভুলিতে পারিবে না। কারণ, পলাশির যুদ্ধের স্মৃতির ন্যায়, নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যও বাঙালীর চিত্তপটে চিরদিন অম্লান থাকিবে।

২। যুগাদর্শের কবি নবীনচন্দ্র

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি-বিধান করেন।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—যে কয়জন কবি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়া কাহিনীকাব্য বা মহাকাব্য রচনা করেন, তাঁহাদের সকলেরই কাব্যের ও কবিতার মূলকথা দেশপ্রীতি। নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার মূল অবলম্বনও দেশপ্রীতি। কাব্যের মধ্যে দেশানুরাগ প্রকাশ করা নবীন-সাহিত্যের বিশেষত্ব।

নবীনচন্দ্রের কাব্য অবদান সংখ্যায়, আয়তনে, গুরুত্বে অসাধারণ

হইলেও, তাহারা বাংলা সাহিত্যে স্বল্পালোচিতই রহিয়া গিয়াছে। ইহা কবির ও জাতির দুর্ভাগ্য। কিন্তু নবীনচন্দ্র জানিতেন—

"কবিরা কালের পক্ষী, কালের শিক্ষক
কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।"

তাই আপন কবি-প্রতিভা ও কাব্য-সৃষ্টির অবিনশ্বরতা সম্পর্কে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। সাহিত্যের রূপাদর্শের বিচারে নবীনচন্দ্রের নানা ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করা শক্ত নহে; কিন্তু যুগদ্রষ্টা ও যুগ-স্রষ্টা রূপে শ্রেষ্ঠ কবিদের যে স্বীকৃত মর্যাদা—যেই কারণে প্রাচীন ভারতের কবিরা 'কবির্মনীষী' আখ্যায় ভূষিত হইতেন—তাহা হইতে নবীনচন্দ্রকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রতিভাদীপ্ত বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব, পূর্ব হইতে তাঁহার জন্য বঙ্গসাহিত্য-অঙ্গন যেন উৎসব-মুখর হইয়াই ছিল। সাহিত্যে, ধর্মে, রাষ্ট্রগঠনে, সমাজ-সংস্কারে, জীবন-সাধনায় এই উনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। জাতীয় উন্নতির এই বহুবিচিত্র ক্ষেত্রে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগীদের একত্র সমাবেশে ও দুশ্চর সাধনায় তখন জাতীয় মুক্তি অন্তরে ও বাহিরে ত্বরান্বিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই শতাব্দীর কোন প্রতিভাকেই যুগনিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করা চলে না। নবীনচন্দ্রও সেই যুগাদর্শের কবি রূপে ভাবিত ও পূজিত হইবেন এবং সেই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহার কবি-প্রতিভার আলোচনা করিতে হইবে।

নবীনচন্দ্র যে যুগে আবির্ভূত হন সেই যুগে বাঙালী ভাবসাধক পাশ্চাত্য মানসিক ভাব সাধনার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছে। দেব-মাহাত্ম্যে আর তাহার রুচি নাই, লোকোত্তর প্রতিভা-সম্পন্ন যুগাবতার নরদেহধারীর মধ্যে দেবচরিত্রের চরমোৎকর্ষ দেখিয়া তাঁহাদের স্তুতি গাহিয়াই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে চাহিয়াছে। সেই যুগ চেতনাহীন জীবন্মৃত জাতির নবজাগৃতির যুগ। ব্যক্তি-জীবনে মনুষ্যত্বের কোনো আদর্শ নাই; সুতরাং জাগরণী মন্ত্রের উদ্গাতা কবি,

দার্শনিক, কর্মী, সকলেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ খুঁজিয়াছেন প্রাচীন মহামানবের মধ্যে। ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শনেও তখন এই 'হিউম্যানিজম্' (Humanism) বা মানবতাবাদের জয় জয়কার। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন স্বকীয় মানবতাপ্রীতি ও জাগ্রত বুদ্ধিতে ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাবণ ও মেঘনাদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইলেন মনুষ্যত্ব ও পুরুষকারের মহিমা। ঋষি বঙ্কিম ঐশ্বর্যময় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকেই মহামানবরূপে উপস্থাপিত করিলেন। আর সেই যুগেরই সন্তান, কবি নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু পূর্বেই ভারতবর্ষে এক ধর্মরাজ্য স্থাপনকারী নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস', ত্রয়ী কাব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর 'খৃষ্ট' কাব্যে যীশুর প্রেমময় জীবন-লীলা এবং 'অমিতাভে' ভগবান বুদ্ধের পূত-জীবনগাথা এবং তাহারও পরে 'অমৃতাভে' চৈতন্যদেবের জীবনলীলা বিবৃত করিয়া নানাযুগের সর্বমানবস্বীকৃত মহামানবতার জয়গানে সমগ্র জাতির হৃতমনুষ্যত্ব পুনরুদ্বোধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের স্বতঃউচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রীতির মূলেও সেই যুগাদর্শ কার্য করিয়াছে। যুগের প্রারম্ভে ঈশ্বরগুপ্ত যখন আবেগভরে বলিয়াছিলেন :

> "ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
> প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
> কত রূপে যত্ন করি দেশের কুকুর ধরি
> বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

তখন পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কৃতিপ্রণোদিত জাতীয়তাবোধের জন্ম হয় নাই। তাঁহার সরল অথচ সুস্থ স্বদেশ-তন্ময়তায় যে স্বাজাত্যাভিমান ও দেশপ্রেম পরিস্ফুট হইয়াছিল, আজিকার বিশ্বপ্রেমচর্চায় তাহা অবান্তর ও অযৌক্তিক বিবেচিত হইতে পারে; তবু সেই স্বদেশীয় ঐতিহ্যে বিপুল শ্রদ্ধা ও জাতীয় দৈন্যে বিপুল বেদনাবোধই পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়া রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে প্রেরণাসঞ্চারক প্রাণদ শক্তিমন্ত্রে

পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। বঙ্কিম, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্রও পরাধীনতার জ্বালাময় উষ্ণধূমে রুদ্ধশ্বাস হইয়া একই সময়ে আত্মগ্লানিতে আর্তনাদ করিয়াছেন :

'আমাদের হায় ! কোন্ পাপের এ ফল :
করে ভিক্ষাপাত্র—কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল।'

জাতীয় গৌরবের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন তিনিও দেখিতেন। কবির রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, ত্রয়ী কাব্যের রূপক ভিন্নতর ; খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্যসূত্রে বাঁধিয়া দিবার অপূর্ব পরিকল্পনা তাহার বৈশিষ্ট্য। মহাভারতীয় ঘটনাস্রোতকে পটভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কবির ঐশ্বর্যময় কল্পনা সমসাময়িক পরপদদলিত শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষকেই চিত্রিত করিয়াছে। যে 'পলাশির যুদ্ধ' রচনা করিয়া নবীনচন্দ্র সেই দিন জাতীয় কবির (National Poet) দুর্লভ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কাব্যমূল্য হয় তো অধিক নহে। কিন্তু বাঙালীর স্বাধীনতাস্পৃহা ও ক্ষত্রবীর্যের যে মহিমাগাথা জ্বলন্ত ভাষায় কবি তাহাতে বিরচিত করিয়াছেন, তাহার পূর্বে মধুসূদনের নিকট হইতেই কেবল এমন পৌরুষদৃপ্ত উদাত্ত কণ্ঠ শ্রুত হইয়াছিল। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে পুরুষ প্রাণের প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্ত, নবীনচন্দ্র তাঁহারই যোগ্য উত্তরসাধক। 'রঙ্গমতীর' কাহিনীসূত্রে এবং 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র খণ্ড কবিতাসমূহের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারায় স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য অন্তরমথিত বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ বঙ্কিম-দীনবন্ধু-নবীন—ইঁহারা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, ইংরেজ সমাজে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ ; তৎসত্ত্বেও এমন অকুতোভয়, দেশগতপ্রাণ বীরপুরুষ আজিকার দিনে সত্যই দুর্লভ।

নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার মধ্যে আরো একটি যুগলক্ষণ সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। গল্প উপন্যাস নাটকের মত মহাকাব্যের রূপাদর্শও মুখ্যতঃ আমরা ইংরেজি সাহিত্য হইতে লাভ করিয়াছি। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকাব্যের বিষয়বস্তু, রীতি ও প্রয়োগ-বিজ্ঞান বিষয়ে যে বিস্তারিত সূত্র

বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মহাকাব্যের বহিরঙ্গ রূপ মাত্র, মহাকাব্যের মূল আদর্শ ও প্রকৃতি তাহা হইতে ধরা পড়ে না, তবু সংস্কৃতে বহু মহাকাব্য থাকা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সেই আদর্শে বাংলায় মহাকাব্য রচিত হয় নাই কেন? তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মহাকাব্যের বিরাট কল্পনার উপযুক্ত জীবনের বিশালতা ও পৌরুষ-বিশ্বাস তখনও বাঙালী আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাই প্রাণ-সম্পদে গরীয়ান্ মাইকেল মধুসূদনকেই মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত করিতে হয়। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি যে, মহাকাব্য বা দীর্ঘ কাহিনী-কাব্যের যে গ্রন্থন-নৈপুণ্য—সর্ব অঙ্গের বিন্যাস-পারিপাট্যে কাব্যের যে সংহতি-সুষমা—তাহা বোধ হয়, আমাদের সাহিত্যে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'ই প্রথম। পূর্ববর্তী কাব্যের তো কথাই নাই, পরবর্তী মহাকাব্য—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলির তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, কবি-শিল্পীর এই শ্রেষ্ঠ সাধনা আর কোথায়ও এমন সিদ্ধিলাভ করে নাই। য়ুরোপীয় ক্লাসিকাল মহাকাব্যগুলি গভীর রসগ্রাহিতার সহিত পাঠ করার ফলে মধুসূদনের সেই শিক্ষা হইয়াছিল, যাহা এ দেশের মহাকাব্য বা কাহিনী-কাব্যের আদর্শ বা রীতি হইতে লাভ করা সম্ভব ছিল না। মধুসূদনই সর্বপ্রথম মহাকাব্য-রচনায় য়ুরোপীয় কাব্যকলাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহাদের পূর্বসূরীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে—বিগত শতাব্দীর জীবন-সাধনারই শিল্পাকৃতি এই মহাকাব্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবল আঘাতে আলস-শয়নবিলগ্ন বাঙালী জাতি জাগিয়া উঠিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়াস পাইতেছে। জীবনের ও শিল্পের এক বিশাল আদর্শ তাহার সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান রাখিবার জন্য গৌরীশৃঙ্গ-সদৃশ মহাকাব্যের শিল্পাদর্শ অবলম্বিত হইয়াছিল।

ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্রে যাহাকে Epic of growth বলা হয়, তাহাতে কাহিনীর প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের সংস্কার,

মনোভাব, প্রবৃত্তিসমূহ যথাযথ রক্ষা করিবার প্রয়াস থাকে। নাট্যকার-সুলভ নিরপেক্ষতা তাহার শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম। হোমার, ব্যাস, বাল্মীকি, ইঁহারা মহাকাব্যের এই সমুন্নত আদর্শপন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা Epic of Art বা Literary Epic, তাহার বিষয়বস্তু প্রাচীন বটে, তবে তাহাতে কবির সমসাময়িক যুগের ভাবধারা, সংস্কার, নৈতিক ধারণা, সমস্যা প্রভৃতি সুস্পষ্টই আভাসিত হইয়া উঠে। মিলটন এবং তাঁহার অনুকারকগণ এই কাব্যাদর্শেরই ধারক। আমাদের দেশের মহাকাব্য রচয়িতারা মিলটন, বায়রন, স্কটের শিল্পাদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত ; তাই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—ইঁহারা তাঁহাদের যুগের মানবিকতার আদর্শ, স্বকীয় কল্পনা ও প্রবৃত্তির ধর্মক্ষেপে অনুরঞ্জিত করিয়া নিজ নিজ কাব্যে পৌরাণিক চরিত্রাদি অঙ্কিত করিয়াছেন, পৌরাণিক কাহিনীকে নবভাবে ও রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আবার এই তিনজনের মধ্যে নবীনচন্দ্রেই নানা যুগ সমস্যার প্রতিফলন অধিক দৃষ্ট হয়।

মহাকাব্যের সংযত সুগম্ভীর, বিরাট রূপ মধুসূদন তাঁহার অত্যুন্নত বলিষ্ঠ প্রতিভায় ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র অতি সতর্কতা ও শৃঙ্খলা-যুগ প্রবৃত্তির জন্যই নিজ প্রতিভাকে বল্গামুক্ত করিতে সাহসী হন নাই, আর যদিও মুক্ত স্বেচ্ছাচারী কবিপ্রতিভার দর্শনে নব মহাভারত পরি-কল্পনায় স্বর্গমর্ত্যপাতাল অবলীলাক্রমে নিরীক্ষণ করাইয়া নবীনচন্দ্র ক্ষণিকের জন্য সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তবু ভাবাবেগ ও প্রাণধর্মের উচ্ছল প্রবাহে নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য সুসমঞ্জস সংযত রূপ লাভ করে নাই—বরং তাহা পরিপূর্ণ গীতিকাব্যেরই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক হিসাবে হয় তো ভালই হইয়াছে। বাঙালীর মনোধর্মে মহাকাব্যের ঋজুতা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ রস কখনও আশ্রয় পায় নাই, তাই এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যেই মহাকাব্য রচনার সূচনা ও অবসান আমরা দেখিলাম। একমাত্র মধুসূদনেই মহাকাব্যের সাধনা ও সিদ্ধির পূর্ণ রূপ প্রকটিত হইয়াছিল। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মধুসূদন জোর করিয়া মহাকাব্য রচনা করেন

নাই ; তাঁহার কাব্যে কবির নিজস্ব একটা কবি-ভাব বা কবি-স্বপ্ন ছিল বলিয়াই, মধুসূদনের রচনা সত্যকার কাব্য হইয়াছে, ফরমায়েসী মহাকাব্য হয় নাই। বাংলায় খাঁটি মহাকাব্য একখানিও হয় নাই। বাঙালীর ধাতুতে তাহা হইবার নহে। গীতিকাব্যরস প্রবণতা বাঙ্গালীর স্বভাব-সিদ্ধ, তাই মহাকাব্যের একরূপ শেষ কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে গীতি-কাব্যোচ্ছ্বাস এত অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং উহারই সুষ্ঠু পরিণতি রবীন্দ্র-নাথে। আর কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করিলে নবীনচন্দ্র হয় তো বা শ্রেষ্ঠ গীতিকবিই হইতেন। মহাকাব্য ধারার পাশে পাশেই প্রবহমান, গীতি-কাব্য ধারাকে যখন বিহারীলাল প্রাণোজ্জ্বল করিয়া রাখিতেছিলেন, সেই সময় নবীনচন্দ্রের কবিপ্রাণেও তাহার স্পর্শ লাগা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এইখানেও তাঁহার মধ্যে সেই যুগের আদর্শ বর্তমান।

৩। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা

নবীনচন্দ্রের প্রতিভার দুইটি দিক আছে। একদিক, তাঁহার জন্ম-ভূমির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগে উদ্ভাসিত ; আর একদিক, সমগ্র মানব-জাতির প্রতি জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রীতির আলোকে আলোকিত। তাঁহার কবিপ্রতিভা ছিল গিরিকন্দরসমুৎসারিত মুক্তগতি নির্ঝরিণীর ন্যায়। স্বর্গমর্ত্যবিহারিণী কল্পনা ও অপ্রতিরোধ্য আবেগোচ্ছলতা যে কবির মননে ও কর্মে প্রতিফলিত, পর্বতের বিশালতা ও গাম্ভীর্য এবং সমুদ্রের দুর্বার গতিবেগ ও তরঙ্গোচ্ছ্বাস যে কবির চিত্তধাতুকে গঠিত করিয়া অপরূপ বাণীমূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছে, তাঁহার উপর জন্মভূমি চট্টলার আবেষ্টনী প্রভাব একেবারে উপেক্ষা করা চলে না।

প্রাকৃতিক ও পারিবারিক প্রভাব যে হৃদয়বান কবিকে কত সমৃদ্ধ করিয়াছিল তাহা নবীনচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন: "আমার মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী। বনমাতার দিগন্তব্যাপী পর্বতমালায় কবিতা তরঙ্গিত হইতেছে, তাঁহার পাদস্থিত নির্ঝরকণ্ঠে কবিতা অবিরল

গীত হইতেছে, তাঁহার নীল ফেনিল সিন্ধুগর্ভের তরঙ্গভঙ্গে কবিতা লীলা-তরঙ্গ দেখাইতেছে, তাঁহার বহু নদনদীস্রোতে রজতধারে কবিতা বহিয়া সেই সিন্ধুমুখে ছুটিতেছে।...যাহার এরূপ পিতা, এরূপ বংশ, এরূপ মাতৃভূমি, তাহার হৃদয়ে যে শৈশব হইতেই কবিতানুরাগ সঞ্চারিত হইবে, কল্পনায় অস্ফুট হিল্লোলমালা খেলিবে, তাহা আর আশ্চর্য কি?...কবিতানুরাগ আমার রক্তমাংসে, অস্থিমজ্জায়, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে, আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।...আমার বয়স যখন দশ এগার বৎসর, তখন হইতে গুপ্তজার অনুকরণে কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম। বলাবাহুল্য, সে কবিতায় ছন্দোবদ্ধ কিছুই থাকিত না। সে যেন বিহঙ্গশিশুর প্রথম কাকলি।" (আমার জীবন—১ম ভাগ)।

বিহঙ্গশিশুর এই প্রথম কাকলিই কিছু পরে সপ্তস্বরে অপূর্ব মূর্চ্ছনায় মন্দ্রিত হইয়াছিল। এমন অপূর্ব নিসর্গ তন্ময়তা পূর্বগামী মহাকবি মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের সতর্ক সংযত রচনায় দৃষ্ট হয় না; উহা নবীনচন্দ্রের স্বভাবজাত। প্রকৃতির আশ্রয় যেখানে মিলিয়াছে সেখানে কাব্যস্ফূর্তিও চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। পর্বত ও সমুদ্র, অরণ্য ও প্রান্তর কবির কাব্যে শুধু তাহাদের জড়রূপেই স্থান লাভ করে নাই, কবির কাব্যে তাহাদের ব্যাপকতর স্থান একটা সূক্ষ্ম মনোময়রূপে, কবিমনের দুইটি প্রধান প্রবণতারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পর্বতের আভাস রহিয়াছে তাঁহার কাব্যের উপাখ্যানভাগের নির্বাচনে, প্রধান প্রধান চরিত্রের নির্বাচনে; ইহাদের ভি[illegible] সাধারণতঃ রহি[illegible]ছে পর্বতসুলভ বিরাটতা এবং বলিষ্ঠ উচ্চতা, সমুদ্রের প্রভাব তাঁহার রচনারীতিতে, কল্পনার প্রসারতায়, বর্ণনার বি[illegible] তাহার দুর্বার বেগে, অংসযত চাঞ্চল্যে—পদেপদে স্খলন-পতন-ত্রুটিতে।

মহাকাব্য রচনায় [illegible]য়াস পাইলেও নবীনচন্দ্রের কবিমানসের প্রবণতায় রোমান্টিক ও লিরিক আ[illegible] প্রধান। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভাকে

সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে, তাঁহার পূর্বগামীদের কথা কিছু আলোচনা করা দরকার। বাংলা কাব্যসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন মধুসূদন এবং সেই ছন্দেই তিনি মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া হেম-নবীনের প্রতিভা বিকাশ হইয়াছিল। সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের প্রবর্তনে মধুসূদন ছিলেন সাহসী ও বিদ্রোহী। তাঁহার উত্তরসূরীদের মধ্যে সেই সাহস ও বিদ্রোহ কিছুটা সঞ্চারিত হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদন যে আদর্শের প্রবর্তন করিলেন, হেম-নবীনের কাব্যে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। তবে মধুসূদনের কাব্যাদর্শ হেম-নবীনে অনুসৃত হইলেও হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের প্রতিভার বিশেষত্বটুকুও তাঁহাদের কাব্যে ও কবিতায় পরিস্ফুট। মধুসূদনের কল্পনা, কবিত্ব-শক্তি ও উদ্ভাবনা-শক্তির সহিত হেম-নবীনের কল্পনা, কবিত্বশক্তি ও উদ্ভাবনাশক্তির পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্যের এবং সেই সঙ্গে হেম-নবীনের প্রতিভার বিশেষত্ব আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ইহা দ্বারা নবীনচন্দ্রকে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

মধুসূদন শব্দশিল্পী; শব্দাড়ম্বর দ্বারা তিনি কাব্যের মধ্যে একটা গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের শব্দসম্ভার অল্প; কিন্তু তাঁহার রচনায় যে কঠোর নিরাভরণ সরলতা ও হৃদয়াবেগের উদ্বেলতা আছে, তাহার দ্বারাই তাঁহার কাব্যের মধ্যে পৌরুষ-ব্যঞ্জকভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। মধুসূদন শব্দ-শক্তির সাধক, অপর জন তেজ-ব্যঞ্জক ভাবাবেগের ভাণ্ডারী। নবীনচন্দ্র ছিলেন প্রধানতঃ ছন্দকুশল কবি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবেগ, গতি ও সৌষ্ঠবের অভাব হেমচন্দ্রের মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবেগ, গতি ও সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কাব্যরসের বড় আশ্রয় শব্দের ধ্বনিব্যঞ্জনা। আমাদের সাহিত্যে, আধুনিক কাব্য-শিল্পে, মধুসূদনই সর্বপ্রথম এই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; হেমচন্দ্র বা নবীন সেনের রচনাতে এই উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ তেমন লক্ষিত হয় না।

সাহিত্য-সৃষ্টিতে স্রষ্টার স্রষ্টৃত্বের প্রধান লক্ষণ যে ষ্টাইল, যাহাকে

বলা হয় কাব্যের বাক্‌ভঙ্গী, তাহার উৎকর্ষ মধুসূদনে যেমন দেখিতে পাই, হেম-নবীনে তেমন দেখিতে পাই না। ছন্দে ও বাগ্‌বন্ধে, ধ্বনি ও রূপব্যঞ্জনায় মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম যে কবিভাষার প্রবর্তন করেন তাহা না হেমচন্দ্র, না নবীনচন্দ্র, কেহই তেমন স্বাভাবিকভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের অনুপম বাণীবিন্যাস-ভঙ্গী তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে ছিল। মাইকেলের ভাষা যে কোন্ অর্থে কবি ভাষা, তাহা হেম ও নবীনের ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) "এই যে লঙ্কা হৈমবতীপুরী
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,..."

* * *

"অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে।"

* * *

"শোভিছে আনন্দময়ী বন-রাজী-ভালে
মণিময় সিঁথীরূপে জোনাকীর পাঁতি।"

(মধুসূদন—মেঘনাদবধ কাব্য)

(২) "মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উদ্যম
পরখিতে অস্ত্রবরে, বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা,—"

(হেমচন্দ্র · বৃত্রসংহার)

(৩) "ধন্য আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্ব্বল-মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি; হায়! অনুক্ষণ

নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে,
শোক, দুঃখ, ভয়ত্রাস, নিরাশ প্রণয়
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা···।" (নবীনচন্দ্র—পলাশির যুদ্ধ)

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'বৃত্রসংহারে'র ভাষা শুধুই গদ্য নয়—তাহা সর্বপ্রকার সঙ্গীতবর্জিত, এবং শব্দের সৌষ্ঠবই নাই। নবীনের ভাষাও ছন্দোবদ্ধ গদ্য, তবে ভাবের আবেগমুক্ত হওয়ায় সেই ছন্দ সুরযুক্ত হইয়াছে। এ ভাষায়, ভাবের রসরূপ কোথাও কাব্য হইয়া উঠে নাই, অর্থাৎ বাক্য রসাভিলাষী হইলেও, রসাত্মক, নহে। ইহাদের সহিত মধুসূদনের ভাষা তুলনা করিলে, এই ভাষার সবচেয়ে যে বড় লক্ষণ— সঙ্গীতগুণ (Phrasal music)—তাহা সহজেই কানে ধরা দেয়।

মধু ও হেম উভয়েই প্রাচীন মহাকাব্যের পৌরাণিকী আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। মধুসূদন আদর্শকে হীন করিয়াছেন; হেমচন্দ্র অনুকৃত কাহিনীকে উন্নত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রও পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে যুগোপযোগী sublime রূপ দিয়াছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, তিনজনেই বিদেশী সাহিত্য হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, উপমা ইত্যাদি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করেন। পাশ্চাত্য প্রভাব তিনজনেরই উপর বর্তমান। নবীনচন্দ্রে জুলিয়াস সীজার, রিচার্ড দি থার্ড, প্যারাডাইস লস্ট, চাইলড্ হ্যারল্ড প্রভৃতি কাব্যের কল্পনাদর্শ বর্তমান—অর্থাৎ, সেক্সপীয়র, মিলটন ও বায়রনের প্রভাব নবীনচন্দ্রে বিদ্যমান—বিশেষ করিয়া বায়রনের। 'পলাশির যুদ্ধের' প্রথম সর্গে প্যারাডাইস লস্টের প্রভাব অনুভূত হয়—আর কাব্যখানির আদ্যোপান্ত বায়রনের Childe Harold-এর প্রেরণা কার্য করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। 'পলাশির যুদ্ধে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন: "বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বায়রণের ন্যায়, তাঁহারও শক্তি আছে,

যে, দুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বায়রন বলিয়া পরিচিত করিতে পারি।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, বায়রনের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, বাংলার বায়রনের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডে বায়রন যেমন বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াছেন, এদেশেও নবীনচন্দ্র সেইরূপ হইয়াছেন। যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী না হইলে যুগকে অতিক্রম করিয়া কেহ সগৌরবে দাঁড়াইতে পারেন না। নবীনচন্দ্রের প্রতিভা তেমন ছিলনা। তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি; তিনি হৃদয়াবেগে লিখিতেন, মস্তিষ্কের সহিত তাঁহার কাব্যের ক্বচিৎ যোগ ছিল। নবীনচন্দ্র স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় নিখুঁত ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবি-কল্পনা নভোস্পর্শী ছিল না, তাঁহার দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে স্বপ্নের অভাব—সেই স্বপ্ন, যাহার মধ্যে আমরা পাই কবি-প্রাণের অসীম আকুতি।

কাব্য বুঝিবার পক্ষে কবিকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে, আধুনিক কাব্য-সমালোচনার ইহা একটি সর্ববাদিসম্মত নীতি। নবীনচন্দ্রের জীবন আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। নবীনচন্দ্র যদি তাঁহার সুবৃহৎ আত্ম-চরিতে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করিয়া, তাঁহার কবি জীবন ও কবি-চরিত্রের উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে কবিকে বুঝিবার পক্ষে আমাদের কিছু সুবিধা হইত। পূর্বে যুগাদর্শের কথা বলিয়াছি, এইবার যে যুগে নবীনচন্দ্রের জন্ম, সেই যুগ-প্রবৃত্তির কথা সংক্ষেপে বলিব; ইহার দ্বারা তাঁহার কবি-প্রতিভার একটা মূল্য-নির্ণয় সহজ হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম-চন্দ্র প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে নবযুগ বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার বাহ্যিক লক্ষণ ছিল—ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে প্রাচীনের প্রতি সন্দেহ, এবং অন্ধবিশ্বাসের উপরে ব্যক্তিগত বিবেক বা যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। শিক্ষিত বাঙালী সমাজে এই যুগে যে উৎকণ্ঠা

জাগিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল দুই বিপরীত সংস্কৃতির মর্মগত বিরোধ। যে ভাবচিন্তার আঘাতে সেকালের বাঙালী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, ইংরেজ চরিত্র ও ইংরেজের শাসন-নীতিগত আদর্শ। পূর্বসূরাদের ন্যায়, নবীনচন্দ্রের বিদেশীয় কাল্‌চারগত ভাবসৌন্দর্যকে পরম-সত্যরূপে বরণ করিবার মত বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি ছিল না, এবং তাঁহার মূল উৎসবারিও তিনি আকণ্ঠ পান করিতে সক্ষম হন নাই। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বাঙালীর মনকে আঘাত করিল, তাহার চিন্তাকে আঘাত করিল এবং যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল এবং যাহার ফলে মনুষ্য-জীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা 'হিউম্যানিজম্'-ই মানুষকে এক নব ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল—বাঙালীর পক্ষে সেদিন তাহা সঞ্জীবন-মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছিল, সেই মানবতা বা মর্ত্যপ্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল।

এই যুগ-প্রভাব বা যুগ-প্রবৃত্তি নবীনচন্দ্রের জীবন ও তাঁহার কবি-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াছিল। প্রথম যৌবনে তিনি বায়রনের কবি-প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ, কাব্যে আত্মাভিমান প্রসূত হৃদয়াবেগের উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মানস-উৎকণ্ঠামূলক আদর্শবাদ ত্যাগ করিয়া তিনি য়ুরোপের রেণেসাঁস-যুগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই ; ফলে, তাঁহার কাব্যপ্রেরণা ব্যাপকতা বা গভীরতা লাভ করিয়া কালোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। তিনি নব মহাভারত রচনা করিয়াছেন, কিন্তু নব জীবনের নব বাণীর বিপুল আশ্বাস তাঁহার কাব্যে কোথাও ঝঙ্কৃত হয় নাই। যেভাবে বিদ্রোহী মধুসূদন পাশ্চাত্য প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়া কাব্যের নব আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র তাহা পারেন নাই, এমন কি, সে যুগের মানসিক উৎকণ্ঠাকেও তাঁহার কাব্যে সম্যক প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—যে কয়জন কবি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়া কাহিনী-কাব্য রচনা করেন,

তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক জায়গায় মিল ছিল—তাঁহাদের সকলেরই কাব্যের ও কবিতার মূলকথা দেশপ্রীতি। নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূলকথাও দেশপ্রীতি। পলাশির যুদ্ধ ও রঙ্গমতী নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যত্রয় রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসেও এই দেশপ্রীতি উৎসারিত হইয়াছে। এই কাব্যত্রয়ে কবি পৌরাণিক মহাভারতের আখ্যায়িকাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একটা বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য, একটা বিরাট ধর্ম স্থাপন ও পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছেন। এই কাব্যত্রয়ে কবির পরিকল্পনা অতি সুন্দর। জাতির মনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মের যে উচ্চ ভাব জাগাইয়া তোলার প্রয়োজন ছিল, তাহা কবি এই কাব্যত্রয়ের সাহায্যে জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই বলিতে হয় যে, কাব্যের মধ্যে নিখুঁত দেশানুরাগ ও ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করাই নবীনচন্দ্রের সাহিত্যের বিশেষত্ব। কিন্তু দেশানুরাগ বা ধর্মতত্ত্ব নিছক কল্পনা অথবা কবিত্বের উপর ভিত্তি করিয়া রূপ পাইতে পারে না। সেইজন্য ভাব ও ভাবনায় নবীনচন্দ্রের কাব্য সমৃদ্ধ হইলেও কাব্য হিসাবে তাঁহার রচনা পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে নাই।

মধুসূদনের মত নবীনচন্দ্রের কল্পনা কাব্যপ্রধান (Poetic) নহে; তাই তাঁহার কাব্যপ্রেরণায় কাব্যসঙ্গীত ধরা দেয় নাই। তাঁহার কাব্য-রস এই কারণেই সৌন্দর্যময় নহে। তবে তাঁহার কল্পিত বিষয়-বস্তুর চমৎকারিত্ব আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। আধুনিক যুগের ভাব-ধারার সহিত মহাভারতের আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাব্য রচনা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক, কিন্তু প্রাচীনের সহিত নবীনের সমন্বয়-সাধনে যে লোকোত্তর প্রতিভার প্রয়োজন, তাহার অভাবেই নবীনচন্দ্রের কাব্যসৃষ্টি এক প্রকার ব্যর্থ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রে যেরূপে ইতিহাসের আদর্শকে নূতনভাবে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, নবীন-চন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র আর প্রভাসে সেই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু

বাঙালীর নবসংস্কৃতির গুরু বঙ্কিমচন্দ্র যাহা পারিয়াছেন, নবীনচন্দ্র তাহা পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমের কৃষ্ণ-চরিত্রে ও নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট কৃষ্ণ-চরিত্রে সাদৃশ্য আছে। শুধু সাদৃশ্য নহে. বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্রের অনুকরণ করিয়াই নবীনচন্দ্র তাঁহার রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কাব্য দুইখানি রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা নবীনচন্দ্রের কবিত্বে মিলিয়া গিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীনচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ঋণী—যদিও এ ঋণ তিনি আদৌ স্বীকার করেন নাই। তবে নবীনচন্দ্রের মৌলিকতা যে একেবারে নাই, তাহা নহে। নবীনচন্দ্র সর্বত্রই ভাগবতের কোমলতা ও মহাভারতের কঠোরতা, ব্রজলীলার প্রেম ও কুরুক্ষেত্র-লীলার নিষ্কামতা, অর্থাৎ ভাগবত ও মহাভারত এই উভয় মিলাইয়া রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ-চরিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহাভারতরূপ কাব্যসমুদ্রকে এক নূতন ছাঁচে ঢালিতে গিয়া তিনি নব-মহাভারত রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা মৌলিক কাব্য হইয়া উঠে নাই—মহাকাব্য হওয়া তো দূরের কথা। একটা প্রবল ভাবপ্রবণতা অপূর্ব সুরে ও ঝঙ্কারে এই কাব্যত্রয়ের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার সবচেয়ে বড়ো কথা হইল এই যে, ভাব, ভাষা ও ছন্দের কোথাও জড়তা নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যে আমরা তাই লক্ষ্য করি ভাবের সৌষ্ঠব, ভাষার নমনীয়তা, ছন্দের একটা হিল্লোলিত আবেগ আর গতি ও ঝঙ্কার। কাব্য হিসাবে না হইলেও, তাঁহার পলাশির যুদ্ধ তাই সুরে ও ঝঙ্কারে অতি উপাদেয় হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যসৃষ্টিতে আছে ভাষার ও ভাবের উচ্ছ্বাস, বায়রনের মতই আবেগের উদ্বেলতা ও প্রবলতা। এই আবেগবহুলতাই তাঁহার কাব্যের ত্রুটি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বলিয়াছি, নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার অবলম্বন দেশপ্রীতি। এই সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দুই একটি কথা বলিবার আছে। ১৮৭১ সালে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম ভাগ) প্রকাশিত হয়।

ইহাতে কবিধর্মের বহু ত্রুটিই বিদ্যমান। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কবি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন: "আমি লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না।......এই স্বদেশপ্রেম কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়. এবং যশোহরে শিশিরবাবুর (অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ) সংস্পর্শে আসিয়া উহা দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। বোধ হয় শিশিরবাবু গদ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়, (অমৃতবাজার প্রথমে বাংলা কাগজ ছিল, প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আইন পাশ হইলে ইহা ইংরেজিতে রূপান্তরিত হয়) এবং আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি।" (আমার জীবন, ২য় ভাগ)। নবীনচন্দ্রের এই উক্তিটি ইতিহাস-সম্মত সত্য নহে। শিশিরবাবুর কথা তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মপ্রচারের মোহে কবি নিজের কথা একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন। যদি ধরিয়া লই যে কবি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে দেশাত্মমূলক কবিতা লিখিতে শুরু করেন, তাহা হইলেও তাঁহার 'প্রথম অশ্রুবর্ষণের' দাবী টিকিতে পারে না। হিন্দুমেলার উদ্যোগে বাংলার ইতিহাসে এই সময়টি ছিল জাতীয় জাগরণের উষাকাল—জাতীয় সঙ্গীতের অভ্যুদয়ের যুগ। এই সময়কার (১৮৭০) বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক কবিতা—হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত", নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক কবিতার অনেক আগেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' শীর্ষক যে-গানটি গাওয়া হইয়াছিল, তাহাই ছিল বাংলা তথা সর্ব-ভারতের প্রথম জাতীয় সংগীত। এমন কি, রঙ্গলালের প্রসিদ্ধ কবিতা 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' নবীনচন্দ্রের বহু আগে (১৮৫৮) রচিত। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে বল ভারত রে'—পর্যন্ত নবীনচন্দ্রের পূর্ববর্তী। অতএব নবীনচন্দ্রের 'প্রথম অশ্রুবর্ষণের' দাবী একেবারেই টিকিতে পারে না। আর এক কথা, বায়রনের অনু-

করণে লেখা নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার সহিত এইসব খাঁটি দেশাত্মপ্রেমের কবিতার তুলনাও হাস্যাস্পদ। একজন রাজকর্মচারীর পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল, নবীনচন্দ্র তাহা করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যে ও কবিতায় দেশপ্রীতির সুর বাঙালী কোনও দিনই অস্বীকার করিবেনা।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতির দ্বিতীয় চিত্র 'রঙ্গমতী'। এই কাব্যের ঘটনাক্ষেত্র কবির জন্মভূমি চট্টগ্রাম। কবি তাঁহার স্বীয় জন্মভূমির সৌন্দর্যে বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া স্বাধীনতার সঙ্গীত গাহিয়াছেন এবং দেশমাতার চরণতলে আত্মবিসর্জন দিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। কল্পনার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দেশের অধ্যাত্ম-ভাবকে জাগাইয়া তুলিয়া একটা বিরাট জাতি গড়িবার অভিলাষকে নবীনচন্দ্র প্রচার করিয়াছেন তাঁহার 'রঙ্গমতী'তে। সেই হিসাবে ইহা একাধারে স্বাধীনতামূলক এবং অধ্যাত্মভাব-মূলক কাব্য। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' এই কাব্যগ্রন্থখানি সম্পর্কে সমালোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছিল: " 'পলাশির যুদ্ধে' নবীনবাবু যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা গৈরিক নিস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্গীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্মভেদী রোদন 'রঙ্গমতীর' অস্থিপঞ্জর! প্রভেদ এই, 'পলাশির যুদ্ধ' কেবলমাত্র সুপদ্যের সমষ্টি, তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। 'রঙ্গমতী' কাব্যের কেন্দ্র আছে, বীজ আছে! সুতরাং, কবি, কাব্য-সোপানে আর এক পদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।"

ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্রের অন্যতম কবি-কীর্তি রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার ইহা পরিণত দান। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি-সৌধ। তাঁহার সমগ্র কবি-সত্তা এই কাব্যত্রয়ে সুন্দরভাবে ধরা দিয়াছে। তাঁহার প্রতিভার সমস্ত স্বধর্ম-সুদূরবিস্তৃত পটভূমিতে মহাকাব্য গঠন, প্রাচীন ইতিকথার মধ্যে কল্পনাবলে বর্তমান যুগসমস্যার প্রতিচ্ছবি অবলোকন এবং ভাব ও ভাষার

বিপুল আবেগ—এ সবই উৎকর্ষে অপকর্ষে এই কাব্যত্রয়ীতে মুকুলিত ও মুঞ্জরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র কাব্য দুইখানি লইয়া সেই সময় তুমুল বিতর্ক ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপ্রীতিকর এই বিতর্কের পুনরাবৃত্তি এখন নিষ্প্রয়োজন। এই কাব্যত্রয়ে কবি পৌরাণিক মহাভারতের আখ্যায়িকাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। প্রত্যেকখানি কাব্য মহাভারতের পৌরাণিক উপাখ্যানের অংশবিশেষ লইয়া রচিত কিন্তু প্রত্যেকটি কাব্যে কবি মহাভারতের অলৌকিক ঘটনাবলীকে পরিবর্তিত করিয়া এক নূতন সাজে সজ্জিত করিয়া এক অভিনব ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যত্রয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতার শ্রেণী হইতে মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া তাঁহার পূজা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেবতা নহেন—এক বিরাট পুরুষ। এই কাব্যত্রয়ের শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ব্যাসদেব শৌর্য, মহত্ত্ব ও জ্ঞানের অবতার। এই কাব্য তিনখানির মূল কথাও স্বদেশপ্রীতি, কবির স্বদেশপ্রীতি এই তিনখানি কাব্যে নূতনরূপে প্রকাশিত। দেশের অন্তরে ভগবানের অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিয়া, ভগবদ্ভক্তির আনন্দময় স্রোত প্রবাহিত করিয়া, দেশকে নীতির দিক দিয়া উন্নত ও ধর্মপ্রাণ করিয়া তুলিবার যে আকুল প্রয়াস—তাহাই নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে প্রকাশ পাইয়াছে। কবি এই কাব্যত্রয়ে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারতের অলৌকিক ঘটনা-রাশির মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া কর্মক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন এবং তাঁহাকে ভারতের ধর্ম সংস্কারক ও মহা-ভারত প্রতিষ্ঠাতারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রৈবতক পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন, "তুমি সত্য সত্যই এক অভিনব মহাভারত সূচনা করিয়াছ···এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষার কার্য বুঝি আর কেহ করে নাই।" আর 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ নবীনচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে 'অত্যাশ্চর্য মহতী কল্পনা' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রৈবতকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "নবীনচন্দ্র স্বীয় প্রতিভার আলোকে ভূত

ইতিহাসের অন্ধকার ছায়া আলোকিত করিয়াছেন। অদ্ভুত প্রতিভাবলে পুরাতত্ত্ববিদের বহু গবেষণায় আবিষ্কৃত ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।”

নবীনচন্দ্র কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সাম্যের মহিমা প্রচার করেন নাই। তিনি বুদ্ধদেবের ও চৈতন্যদেবের সাম্যবাদের চারু চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার ‘অমিতাভ’ ও অসমাপ্ত ‘অমৃতাভ’ নামক কাব্য দুইখানিতে। কবি মহাপুরুষ যীশুখৃস্টের জীবনী অবলম্বন করিয়াও ‘খৃস্ট’ নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়া তাঁহার কবি-মনের উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে, কি শ্রীকৃষ্ণ, কি বুদ্ধ, কি চৈতন্য—সকলেই তাঁহার কাব্যে মহাপুরুষরূপে চিত্রিত। কেহই দেবতার অবতার রূপে অঙ্কিত হন নাই। এইখানেই তিনি তাঁহার কাব্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গীতিকাব্য রচনায় কবি নিজ প্রতিভাকে নিয়োজিত করিলে নবীনচন্দ্র হয় তো বা অধিকতর সারস্বত-সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ কবির অনুরূপ আবেগ আছে, স্থানের প্রসারও আছে, কিন্তু অনুরূপ গাম্ভীর্য ও শিল্প-সংযম নাই। তাই দেখিতে পাই নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর মাইকেলের ন্যায় ওজঃগুণ ও গাম্ভীর্য বহন করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যস্ফূর্তির পিছনে হৃদয়বৃত্তির প্রেরণাই আমরা লক্ষ্য করি, তাঁহার কবিপ্রতিভার মধ্যে মানসবৈদগ্ধ্য আদৌ পরিলক্ষিত হয় না।

কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভার সবচেয়ে ত্রুটি এই যে, এতগুলি কাব্যের একটিতেও তিনি চরিত্র-চিত্রণে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। বায়রন-সুলভ বর্ণনার আতিশয্যেই তাঁহার কাব্যগুলি অযথা ভারাক্রান্ত এবং সেই কারণেই কাব্য হিসাবে ব্যর্থ। চরিত্রের বিশ্লেষণে কোন শক্তিই তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং সেই কারণেই তাঁহার কাব্যে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিফলিত হয় নাই। এই মৌলিক ত্রুটির জন্য, কল্পনামাধুর্য ও কবিত্ব সত্ত্বেও, নবীনচন্দ্রের

কাব্যসমূহ বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে যুগকে অতিক্রম করিয়া সগৌরবে দাঁড়াইতে পারে নাই।

৪। 'পলাশির যুদ্ধ' পাঠের ভূমিকা

নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় আমাদের সাহিত্য-সমাজে এখনও অনিশ্চিত হইয়া আছে। যে যুগে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে যুগে সবে মাত্র কাব্য-সমালোচনা শুরু হইলেও, কাব্যের আদর্শ নানা কারণে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যে অর্থে আমাদের দেশের প্রথম আধুনিক কবি, সে অর্থে আধুনিক-ভাবাপন্ন পাঠক আমাদের সমাজে ঐ যুগের শেষেও দেখা দেয় নাই। এবং যেহেতু পরবর্তী যুগের রুচি ও আদর্শ বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে, সেজন্য নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার সম্যক আলোচনা পরেও আর হয় নাই। এ কারণ, সেকালের রসিক সমাজের নানা অগভীর উক্তিই আজো নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ও কবিকীর্তির সম্বন্ধে গতানুগতিক সমালোচনার উপজীব্য হইয়া আছে; নবীনচন্দ্র আজও তাই বাংলার বায়রন হইয়া আছেন।

কবিপ্রাণ ও কাব্যসৃষ্টির সম্বন্ধে একটি এই অতি সহজ নিয়ম মনে রাখিলেই হইবে যে, কাব্যসৃষ্টির মূলে কোনরূপ অসাধ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা, অথবা কোন বিশেষ সাময়িক প্রয়োজন সাধনের অভিপ্রায় না থাকাই শ্রেয়ঃ; কারণ, তাহাতে কবির স্বকীয় কবিপ্রবৃত্তি বাধাগ্রস্ত হয়, এবং সেরূপ হইলে, কাব্য হিসাবে সে রচনা উৎকৃষ্ট না হইবারই কথা। কেবলমাত্র শক্তি নয়, কবিমানসের স্বাধীন স্ফূর্তিও চাই, নতুবা যে কাব্যে অসাধ্য সাধনের কৃতিত্ব যতটা প্রকাশ পায়, কাব্য-গুণে তাহা ততটাই উৎকর্ষলাভ করে না। এইজন্যই কবিকর্মকে 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিত' বলা হইয়া থাকে।

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রেরণামূলে যে নেপথ্য-ইতিহাস আছে

তাহা জানা দরকার। এই সম্পর্কে কবি তাঁহার আত্মচরিতে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত হইল :

"যশোহরে আমাদের আমোদ ও আহারের জন্য একটা সাধারণ সমিতি ছিল। তদন্তর্গত আবার কয়েকটি শাখা সমিতি ছিল—সঙ্গীত সমিতি, সাহিত্য সমিতি, ইয়ার্কি সমিতি। সাহিত্য-সমিতির সভ্য তিনজন—আমি, জগবন্ধু ভদ্র ও মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। জগবন্ধু যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, এবং মাধব তখন উকিল ছিলেন। একদিন এই সমিতিতে স্থির হইল যে আমরা তিনজনে তিনটি বিষয় লইয়া তিনখানি বহি লিখিব। কলেজে অধ্যয়ন সময়ে রামপুর-বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশির যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার সর্বদা মনে পড়িত, এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্বদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাসিত। আমি বলিলাম, আমি পলাশির যুদ্ধ লিখিব। এরূপে, কি কার্যের কি অঙ্কুর শ্রীভগবান কোথায় আমাদের অজ্ঞাতভাবে স্থাপন করেন, তাহা তিনিই জানেন। জগবন্ধু রাজস্থানের এবং মাধব সিপাহী-বিদ্রোহের, কোনও ঘটনা লিখিবেন স্থির হইল। আমার যেই কথা সেই কাজ। আমি চিরদিনই একজন ব্যস্তবাগীশ। আমি তখনই 'পলাশির যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতাকারে লিখিলাম। শরৎকালের রাত্রি প্রভাত হইতেছে। পূর্বগগনে ঊষার প্রবাল মুকুট জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি গবাক্ষের কাছে জাগরণ-ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসিয়া পা দুখানি গবাক্ষের কাষ্ঠের উপর রাখিয়া, সেই ঊষার মনোহর বিকাশ শোভা দেখিতেছিলাম, এবং ধীরে ধীরে সদ্য-রচিত এই কবিতাটি একরূপ অজ্ঞাতসারে জাগরণ-সুখ-কণ্ঠে আওড়াইতে ছিলাম।

"পোহাইলে বিভাবরী পলাশি প্রাঙ্গণে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী,
চিত্রিয়া ভারত ভাগ্য আরক্ত বিমানে,
উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি।

শান্তোজ্জ্বল কর রাশি চুম্বিয়া অবনী
প্রবেশিল আম্রবনে ; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ শতদলে ভাসিল অমনি ;—
ক্লাইবের মনে হ'ল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।”

“এঞ্জিনীয়ারবাবু নিদ্রোত্থিতের মত বলিয়া উঠিলেন—“কি! কি! আহা! বড় মিষ্ট লাগিল। কবিতাটি আবার আওড়াও ত শুনি।” আমি আবার আওড়াইলাম।

তিনি। এ কাহার কবিতা ?

আমি। (সলজ্জভাবে) আমার।

তিনি। কই, এ কবিতা ত আমি আগে শুনি নাই।

আমি। এইমাত্র লিখিয়াছি।

তিনি। কি বিষয়ে ?

আমি। পলাশির যুদ্ধ।

তিনি। পলাশির যুদ্ধ! কবিতাটি কত বড় হইবে ?

আমি। সত্তর-আশী শ্লোক হইবে।

তিনি। তুমি ছেলে মানুষ, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। তুমি বাড়ী যাও। কবিতাটি এখনই আমার বাসায় পাঠাইয়া দিবে।”

(যশোহর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শিশুপুত্র পীড়িত হইলে পরে কবি রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করেন। ঘটনার দিন কবি রুগীর শয্যাপার্শ্বেই বিনিদ্র রজনী যাপন করেন এবং সকাল বেলায় সদ্য-রচিত কবিতাটি আবৃত্তি করিবার সময় তাঁহার অলক্ষ্যে যশোহরের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার উহা শুনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সেই সময় ঐ শিশুরুগীটিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের বিবরণে ইঁহারই কথা উল্লিখিত হইয়াছে—‘পলাশির যুদ্ধের’ ইনিই প্রথম রসগ্রাহী শ্রোতা ছিলেন।)

"আমি তাহাই করিলাম। কিছুদিন পরে তিনি এক দীর্ঘ পত্রসহ কবিতাটি ফেরত পাঠাইলেন। পত্রে কবিতাটির অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া, শেষে লিখিয়াছেন যে এরূপ কবিতা সাপ্তাহিক পত্রে ছাপিলে উহা মাটি হইবে। আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। উহা আরও বিস্তৃত করিয়া পুস্তকাকারে ছাপিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। কবিতাটি পড়িয়া রহিল। এই গেল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল।

"১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করি। পিতার পরলোক গমনের পর পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীখানিও ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। উহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই বিদায় লইয়াছিলাম। সেই সময় একদিন ঐ কবিতাটি চক্ষে পড়িল। মনে করিলাম এঞ্জিনায়ারবাবুর উপদেশ মতে এই কবিতাটি বিস্তৃত করিতে পারি কিনা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই চেষ্টার ফল 'পলাশির যুদ্ধ কাব্য'। একখানি ভগ্নাবশেষ বাঁশের দেউড়ির ঘরের এক কক্ষ কাপড়ের পর্দ্দার দ্বারা সজ্জিত করিয়া আমার কবি-কক্ষ করিয়া লইলাম। গৃহ-নির্ম্মাণের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া প্রাতঃকালে মধ্যে মধ্যে যে সময়টুকু পাইতাম, সে সময়ে 'পলাশির যুদ্ধ' লিখিতাম। প্রাতঃকালে ভিন্ন লিখিতে পারিতাম না। কত দিন লিখিয়াছিলাম মনে নাই। বড় বেশী দিন নহে। ছুটীর মধ্যেই কাব্যখানি শেষ হয়। কিন্তু গ্রামে এমন কেহ নাই যে সাহিত্য সম্বন্ধে একটি কথা বলি বা পরামর্শ করি। তখন স্ত্রীও বালিকা বিশেষ। লেখাপড়ার বড় বেশী ধার ধারিতেন না।

"ছুটীর পর সহরে আসিয়া বাবু কাশীচন্দ্র সেনকে উহা নকল করিতে দিলাম। কাশী নিজেও একজন কবি। আমরা কলেজে থাকিতে সে 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে কতকগুলি খণ্ড কবিতা 'কুসুমাঞ্জলি' নাম দিয়া ছাপিয়াছিল। তাহাতে বেশ একটু শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। সে

পর্য্যন্ত 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে মধুসূদনের অনুকরণে এরূপ কৃতিত্ব আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই।...কাশী সময়ে সময়ে কাব্যখানির বড়ই প্রশংসা করিত। যেদিন নকল শেষ করিয়া আনিল সেদিন অত্যন্ত প্রশংসা করিল; কিন্তু এ কাব্যখানি যে এত প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, সে আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। (এই কাশীচন্দ্র সেন নবীনচন্দ্রের অধীনে কেরানিগিরি করিতেন)।

"ইতিপূর্ব্বে 'একদিন' কবিতাটি লিখিয়া আমি 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করি। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভায় তখন বঙ্গসাহিত্য উদ্ভাসিত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তখনও এ ক্ষুদ্র জীবের পরিচয় হয় নাই। পরিচয় করাও বড় স্পর্দ্ধার কথা মনে করিতাম। কিন্তু 'একদিন' কবিতাটি পাইয়া তিনি আমাকে জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ এক পত্র লেখেন, এবং 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিতরূপে লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, আমি কোথায় আছি তিনি জানিতেন না বলিয়া তৎপূর্ব্বে এরূপ অনুরোধ করিতে পারেন নাই। 'একদিন' 'বঙ্গদর্শনে' যথাসময়ে প্রকাশিত হইল।

"একবার বঙ্কিমবাবু কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিলে আমি 'পলাশির যুদ্ধের' রচনার কথা লিখিলাম। তিনি উহা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পাইয়া লিখিলেন, 'বঙ্গদর্শনে' ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে। উহা পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন এবং লিখিলেন যে, সমালোচনার সময়ে তিনি প্রমাণিত করিবেন যে 'পলাশির যুদ্ধ' বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কাব্য—"next, if at all, to Meghnad—'মেঘনাদ বধের' সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্ত্তী স্থান পাইবার যোগ্য।" আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলে, লিখিলেন উহা 'বঙ্গদর্শন' প্রেসে মুদ্রিত করিবেন। আরও প্রায় ছয়মাস চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমবাবু লিখিলেন,—তাঁহার প্রেসে ছাপিবার সুবিধা হইল না, অতএব 'সাধারণী প্রেসে' ছাপিতে হস্তলিপি (পাণ্ডুলিপি) অক্ষয়চন্দ্র সরকার

মহাশয়কে দিয়াছেন।···প্রায় এক বৎসর পরে 'পলাশির যুদ্ধ' ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে (১৫ই এপ্রিল) প্রকাশিত হইল।

"বঙ্গসাহিত্য জগতে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'সুর' ফিরিয়াছে। তিনি আমাকে লিখিলেন—"It is unfortunate Hem should have made his debut before you—তোমার দুর্ভাগ্য যে হেম তোমার পূর্ব্বে আসরে নামিয়াছেন।" কথাটা বুঝিলাম। পরে শুনিলাম হেমবাবুর 'বৃত্রসংহারের' প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। উহা পড়িলাম, এবং যখন 'বঙ্গদর্শনে' উহার 'পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'-সম্বলিত দীর্ঘ সমালোচনা পড়িলাম, এবং শুনিলাম এমন একটা লাইন সেক্সপিয়ার কি মিল্টনও লিখিতে পারেন নাই, তখন বুঝিলাম।

"কিন্তু বঙ্কিমবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। আমি ত কখনই হেমবাবুর প্রতিযোগিতা করি নাই। আমি তাঁহার পুত্রস্থানীয়। কলেজে তাঁহার 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' আমার পাঠ্য পুস্তক ছিল। যাই হউক 'বঙ্গদর্শনে' 'পলাশির যুদ্ধের'ও খুব উচ্চ রকমের সমালোচনা বাহির হইল। উহাতে বঙ্কিমবাবু আমাকে বাঙ্গালার 'বাইরন' বলিয়া পরিচিত করিলেন। কাব্যখানির একটি মাত্র দোষ দেখাইয়াছিলেন—হেমবাবুর 'বৃত্রসংহারে' চরিত্র চিত্র আছে, 'পলাশীর যুদ্ধে' তাহা নাই। কিন্তু চরিত্র চিত্র করা কি 'পলাশির যুদ্ধ' রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল?···'সাধারণী' সম্পাদক বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার আমাকে পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি 'পলাশির যুদ্ধ'কে মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য বলেন?" আমি লিখিলাম,—আমি উহাকে অকাব্য বলি।

" 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়া মাত্র নবস্থাপিত 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে শুনিয়াছি খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাটক রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ক্লাইবের অভিনয় করিয়া প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। এরূপ চারিদিকে 'পলাশির যুদ্ধ' লইয়া তোলপাড়।" (আমার জীবন—১ম ভাগ)।

ইহাই ‘পলাশির যুদ্ধ’ রচনা করিবার ইতিহাস। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু লিখিবার জন্য কবি ছাত্রাবস্থায় প্রেরণা লাভ করেন ; কিন্তু যে প্রেরণায় কাব্যের জন্ম হয় ঠিক সেই প্রকারের প্রেরণা ইহা নহে ; কাজেই প্রেরণা না বলিয়া ইহাকে কৌতূহল বলাই সঙ্গত। এই প্রেরণা বা কৌতূহলের জন্ম ১৮৬৫। তাহার পর তিন বৎসর পরে কর্মজীবনের প্রারম্ভে অকস্মাৎ সাহিত্য সমিতির আলোচনায় কবির মনে পুনরায় এই বিষয় লইয়া লিখিবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়। সেই ইচ্ছা একটি কবিতায় রূপ পরিগ্রহ করিল। তাহাও খুব দীর্ঘ কবিতা নহে—মাত্র সত্তর আশী লাইনের একটি কবিতা। কবি-কল্পনায় যদি মহতী প্রেরণা থাকিত তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তখনও পর্যন্ত কবির কল্পনায় পলাশির যুদ্ধের বিষয়বস্তু পূর্ণাঙ্গ কাব্যের রূপ লইয়া প্রতিফলিত হয় নাই। যাহা কিছু inspiration একটি মাত্র কবিতায় তাহা ফুরাইয়া গেল।

দ্বিতীয়তঃ, প্রায় আট বৎসর পরে, কবি চেষ্টা করিয়া দেখিলেন যে, কবিতাটি বিস্তৃত করিতে পারা যায় কিনা ! কবি স্বীকার করিয়াছেন, “সেই চেষ্টার ফল ‘পলাশির যুদ্ধ কাব্য’ ”। অর্থাৎ স্বতঃ উৎসারিত না হইয়া ইহা তাঁহার চেষ্টার ফল মাত্র। যে-কাব্যের পিছনে এমন সচেষ্ট প্রয়াস অর্থাৎ laboured effort থাকে, তাহা যে কাব্যাংশে দুর্বল হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ‘হিন্দু পেটিট্রিয়ট’ তাই ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিল : “Though commemorating a great event, it can hardly be called epic poem, for it has none of the elements that constitute a poem of this nature.” কবির স্বকীয় কবি-প্রবৃত্তি এইভাবে দশ বৎসরে তাঁহার কল্পনাকে রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছিল—ইহা যে প্রবল বেগে উৎসারিত হয় নাই এবং কাব্য নির্মাণ কার্যে কবি যে দীর্ঘ সময় লইয়াছিলেন, তাহা হইতে ইহাই

সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, সাক্ষাৎ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার অভাবেই তাঁহার এই কাব্য-সৃষ্টি সুসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

'পলাশির যুদ্ধ' প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য নহে—একটি কবিতার expansion অর্থাৎ বর্ধিত রূপ মাত্র। তাই কাব্যগুণে ইহা ততটা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই যেমন পারিয়াছে কবির পরবর্তী কাব্য তিনখানি। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্য রচনার পিছনে কবির যে প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল তাহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই স্বীকৃত। ১৮৮৬ সালে হেমচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রকে কবি প্রবাসে এক তীর্থস্থান হইতে এক পত্রে লিখিতেছেন; "...... স্থান মহাত্ম্যে উদ্বেলিত হৃদয়ে কাব্যজগতের হিমাদ্রি স্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ আর একবার পাঠ করি।...মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গরেখা এখনও সেই শৈল-উপত্যকার, সেই শেখরমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম তাহার সানুদেশে—সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর, পতিত মানবজাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম—পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। সেখানে রৈবতক সূচিত এবং মহাভারতের সেই পবিত্র শৈলমালার ছায়ায় তাহার অধিকাংশ রচিত হইল।" (এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল বলিয়াই এই কাব্য তিনখানিতে কবির কল্পনা ও ভাবাবেগ কাব্যরসে সঞ্জীবিত হইয়া স্বচ্ছন্দ ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে।) এইরূপ প্রবল অনুভূতি 'পলাশির যুদ্ধে'র পিছনে যে ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

তৃতীয়তঃ, কবি লিখিয়াছেন যে, 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইবামাত্র "বঙ্গসাহিত্য জগতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল" এবং "চারিদিকে 'পলাশির যুদ্ধ' লইয়া তোলপাড়।" কবি এখানে আত্মপ্রচারের মোহে এবং কতকটা তাঁহার পূর্বসূরী, মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের ব্যাপার স্মরণ করিয়াই এইরকম অতিশয় উক্তি করিয়াছেন। কোনো কবিই নিজের মুখে নিজের

রচনার এরূপ আত্মম্ভরিতাপূর্ণ উক্তি করিতে স্বভাবতঃই সংকোচ বোধ করিবেন। 'পলাশির যুদ্ধ' যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহা কাব্যের গুণে নহে, কাব্যের বিষয়বস্তুর গুণে; তবে সে জনপ্রিয়তা 'হুলুস্থুলের' পর্যায়ে যে পৌছায় নাই, তাহা সমসাময়িক পত্রিকার সমালোচনাতেই প্রমাণিত হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ, 'পলাশির যুদ্ধে'র ক্লাইবের ভূমিকার অভিনয় করিবার বহু পূর্বেই গিরিশচন্দ্র খ্যাতিলাভ করেন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে 'নিমচাঁদের' ভূমিকায় অভিনয় করিয়া। তাছাড়া, কবির উক্তিতে দুইটি তথ্যগত ভুলও রহিয়া গিয়াছে। তৎকালীন অন্যতম অভিনেতা অমর দত্ত নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' লইয়া তাঁহার নটজীবনের সূচনা করেন এবং তিনিই গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে ইহা নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে (ন্যাশনাল থিয়েটার নহে) অভিনয় করেন। অমর দত্ত সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস অবলম্বন পূর্বক স্বয়ং 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। অতএব নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' লইয়া যেটুকু তোলপাড় বা হুলুস্থুল হইয়াছিল, তাহা কতকটা রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য।

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের রসবিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবি মাত্র একুশ বৎসর বয়সে এই কাব্যের প্রাথমিক রচনায় (অর্থাৎ ৭০।৮০ লাইনের কবিতা) হস্তক্ষেপ করেন। তখন তাঁহার অনুভূতিই বা কতটুকু আর আয়োজন-উপকরণ সংগ্রহেও তেমন পূর্ণতা ছিল না। পরবর্তী কালে কবি তাই স্বচ্ছন্দে এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ গিরিশচন্দ্রকে এক পত্রে (১৯০৬) লিখিয়াছিলেন: "ভাই গিরিশ, ২০ বছর বয়সে 'পলাশির যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তুমি ৬০ বছর বয়সে 'সিরাজদ্দৌলা' লিখেছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি।

তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশির যুদ্ধ' লিখি তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল।" 'পলাশির যুদ্ধ'-পাঠের এই ভূমিকাটুকু মনে রাখিয়াই অতঃপর আমরা ইহার কাব্য বিচারে ও রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইব।

৫। 'পলাশির যুদ্ধ' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র

নবীনচন্দ্রের রচনার সম্যক সমাদর হইতে খুব বেশী বিলম্ব হয় নাই। এই দিক দিয়া তিনি মধুসূদন বা হেমচন্দ্র অপেক্ষা বেশী ভাগ্যবান ছিলেন। ইহার কারণ, তাঁহার ছন্দকুশলতা ও বর্ণনা-নৈপুণ্য,—এবং ইহাই ছিল তাঁহার কবি কল্পনার সর্বস্ব। তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের কাহিনী-অংশ ও তাহার উদ্ভাবনায় ঐতিহাসিক ত্রুটি থাকিলেও, তাঁহার চিত্তস্ফূর্তির স্বাচ্ছন্দ্যে এবং ভাব ও ভাবুকতার একটি গম্ভীর ও উন্নত আদর্শ-রক্ষার প্রয়াসে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই কাব্যের তরঙ্গায়িত ছন্দঃস্রোত পাঠককে সম্মোহিত ও চমৎকৃত না করিয়া পারে না। তাই এই কাব্য-গ্রন্থখানি প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নবীনচন্দ্র কবি-যশ লাভ করেন।

যে যুগে 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়, তখন বাংলাসাহিত্যের নবজাগরণের নায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রায় একই সময়ে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যেই এই স্মরণীয় কাব্য দুইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের কবি-খ্যাতি নবীনচন্দ্রের বহুপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'বৃত্রসংহার' কাব্যে হেমচন্দ্র আধুনিক যুগোপযোগী কাব্যরস সর্বসাধারণের প্রাণের নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাব্যের অন্তরালে স্বদেশানুরাগের স্রোত অব্যাহতধারায় বহিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই 'বৃত্রসংহারের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। তাই যদিও তিনি 'পলাশির যুদ্ধের' পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া প্রথমে ইহাকে

'Next to Meghnad' বলিয়াছিলেন, পরে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' তাঁহার এই ধারণার পরিবর্তন করিয়া দিল। নবীনচন্দ্র যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, "বঙ্কিমবাবু সুর বদলাইলেন", তাহা ঠিক নহে। কাব্য-গৌরবে 'বৃত্রসংহারের' শ্রেষ্ঠত্ব 'পলাশির যুদ্ধ' অপেক্ষা যে অধিক তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাতেই পরিস্ফুট এবং সেই জন্য তাঁহার সুচিন্তিত সমালোচনাটি এখানে সমগ্র উদ্ধৃত হইল—'পলাশির যুদ্ধের' দোষগুণ বুঝিবার পক্ষে ইহা আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

"'পলাশির যুদ্ধ' ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং 'পলাশির যুদ্ধ' অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যাকারে ইহার বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয় মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছেন। যাহা হউক তাহার সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য্য নাই; নবীনবাবুর গ্রন্থের কথা বলি।

("প্রথম সর্গে, নবদ্বীপবাসী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন প্রধান ব্যক্তিরা শেঠদিগের আগারে বসিয়া সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ করিতেছেন। এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত আমাদিগকে বোধ হয় নাই। অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোন হানি হইত না। ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং নবীনবাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে। এই একটি উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণচন্দ্র কৃত সিরাজদ্দৌলার রাজ্য বর্ণন :)(প্রথম সর্গ হইতে ৪০ শ্লোক)।

("রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগে মধ্যে তাঁহার বাক্যসকল জ্ঞানগর্ভ। তাহা হইতে, হিন্দু-যবনে যে সম্বন্ধ তদ্বিষয়ক নিম্নোক্ত উপমাটি উদ্ধৃত করিলাম :

> "নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি ধর্ম্মের কারণে।
> অশ্বত্থ পাদপ জাত উপবৃক্ষ মত,
> হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

ষড়যন্ত্রে এই স্থির হইল যে, ইংরাজের সাহায্যে অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলাকে দূর করিতে হইবে—সিরাজের সেনাপতিও তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন। রাণী ভবানী এই পরামর্শের বিরোধিনী। ইংরাজের সাহায্য যাহা হইবে, তাহা দৈববাণীর ন্যায় কথাপরম্পরায় রাণী বুঝাইয়া দিলেন, পরে নিজ মত এইরূপে প্রকাশ করিলেন (প্রথম সর্গ ৬৫ ও ৬৬ শ্লোক)। বলা-বাহুল্য যে এ পরামর্শ মত কার্য্য হইল না। এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গে কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গ হইতে এই কাব্যে কবিত্ব কুসুম এরূপ প্রভূত পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে যে, কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত করিবে সমালোচক তাহার কিছুই স্থিরতা পায় না। ইচ্ছা করে সকলই উদ্ধৃত করি। এইরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ দুর্লভ রত্ন সকল ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন। কাটোয়া হইতে ইংরেজ সৈন্যের নদী পার হওয়ার চিত্র তপন-চিত্রিত ফটোগ্রাফ তুল্য এবং ফটোগ্রাফে যে অদ্ভুত রশ্মি নাই—ইহাতে তাহা আছে। অপরাহ্ণ হইয়াছে—(২য় সর্গ ১ হইতে ৩ শ্লোক)। সৈনিকদিগের কেবল বাহ্য দৃশ্য নহে, আন্তরিক ভাবও সুচিত্রিত হইয়াছে। গঙ্গা পার হইয়া, সেনাপতি ক্লাইভ তরুতলে বসিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তিত। ভাবী ঘটনার অনিশ্চয়তা এবং আপনার দুঃসাহসিকতা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি শঙ্কিত। এই অবস্থায় ইংলণ্ডীয় রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন। সেই চিত্রটি যথার্থ কবির সৃষ্টি; রাজলক্ষ্মীকে কবি এক অপূর্ব্ব মহিমাময়ী শোভায় পরিমণ্ডিত করিয়াছেন। (দ্বিতীয় সর্গ ৩৫ হইতে ৩৬ শ্লোক)। তাঁহার বাক্যগুলি আকাশ প্রসূত মেঘধ্বনির ন্যায় আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে: (দ্বিতীয় সর্গ ৫০ শ্লোক)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বর্ণনায় কবির কবিত্ব প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র চিত্রটি দেখ: (দ্বিতীয় সর্গ ৫৪ শ্লোক)। ঐ তরণীর নাবিকদিগের গীত অতি মনোহর—বায়রনের যোগ্য। গীতটি শুনিয়া বায়রন কৃত নাবিকদস্যুর গীত মনে পড়ে।

"তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সিরাজদ্দৌলার শিবিরে নৃত্যগীতের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এমত সময়ে, সহসা ইংরেজের বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ, বায়রন কৃত ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পূর্বরাত্রির বর্ণনা স্মরণে পড়ে: "There was a sound of revelry by night… ।" নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বায়রনের যোগ্য:

"বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্ত-মলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি-পরিমল ;
বিলাস-বিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল ।"

তোপের শব্দে নৃত্যগীত ভাঙ্গিয়া গেল—সিরাজদ্দৌলা ভবিতব্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার উক্তিগুলিতে, তাঁহার স্বার্থপর, অধ্যবসায়হীন, দুর্ব্বল, ভীত চিত্ত অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে। এই কাব্যে কবি চরিত্রের আশ্লেষণ শক্তির তাদৃশ পরিচয় দেন নাই বটে, কিন্তু এস্থলে বিশ্লেষণ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। নবাব, আপনার কর্ম্মফল ও চরিত্রদোষ চিন্তা করিয়া, ভয়বিমূঢ় হইয়া, মীরজাফরের শরণ লইব ভাবিয়া দৌড়িলেন, কিন্তু ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার একজন স্নেহময়ী মহিষী তাঁহাকে তুলিয়া অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। এ দিকে এক বৃটিশ যুবক—"প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার!" ইত্যাদি এক সুমধুর গীতধ্বনি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। এইরূপে রজনীর প্রভাত হইল। তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল।

"এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ কাব্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য্য (action) অতি অল্প; যাহা আছে তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে। অল্প ঘটনায় বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গ সকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এই মাত্র; দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজ সেনা

গঙ্গা পার হইয়া পলাশিতে আসিল, এই মাত্র ; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না। কিন্তু কবির ওজস্বিনী কবিতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, এ সকল দোষ লক্ষিত করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

"চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধ বর্ণনা অতি সুন্দর। তৎপরে মোহনলালের যে বীরবাক্য আছে, তাহা আরও সুন্দর ! সত্য, ইতিহাসে ইহা কীর্তিত আছে যে, হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল পলাশিক্ষেত্রে ক্লাইবকে প্রায় বিমুখ করিয়াছিলেন, এবং যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তবে ভারতসাম্রাজ্য অদ্য কে ভোগ করিত তাহা বলা যায় না। যবনসেনা পলায়নোদ্যত দেখিয়া মোহনলাল তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিব কি ? পাঠকের ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া আপনি পাঠ করিবেন। তাঁহার বাক্যে সৈন্য আবার ফিরিল, আবার রণ হইতে লাগিল—কিন্তু এমত সময়ে শঠ মীরজাফরের পরামর্শে নবাব রণ স্থগিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। নবাবের সৈন্য তখন রণে নিবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া ইংরেজ দ্বিগুণ বল করিল। ইংলণ্ডের রণজয় হইল। সূর্য্যাস্ত হইল। কবি সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া নিজ মনের কথা কিছু লিখিয়াছেন, কিন্তু এরূপ উপাখ্যান কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নির্দ্দিষ্ট নহে। 'চাইল্ড হেরল্ডে' বায়রন সচরাচর এরূপ মন্তব্য পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোক মুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু 'চাইল্ড হেরল্ড' বর্ণনা কাব্য, আর 'পলাশির যুদ্ধ' উপাখ্যান কাব্য। যাহা 'চাইল্ড হেরল্ডে' সাজে, 'পলাশির যুদ্ধে' তাহা সাজে না। এই কাব্যে কার্য্যের গতিরোধ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। কিন্তু এ কাব্যের গতি অতি মন্দগামী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"পঞ্চম সর্গে নেতৃগণের উৎসব, সিরাজদ্দৌলার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। 'মেঘনাদ বধ' বা 'বৃত্রসংহারের' সহিত এই কাব্য তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে, কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া,

কল্পিত এবং সুরাসুর রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। 'পলাশির যুদ্ধের' ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ; আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না। এই সর্গের প্রধান ত্রুটি এই যে কবি সিরাজের পত্নীর মুখে একটি শোক-সঙ্গীত দিয়াছেন। শোকের সময় সঙ্গীত মুখে আসে কিনা, বড় সন্দেহের কথা।" (প্রথম সংস্করণে ইহা ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে কবি ইহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।)

"তবে এই কাব্য মধ্যে ঘটনা-বৈচিত্র্য, সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সংঘটন করা, কবির সাধ্য বটে, তৎসম্বন্ধে নবীনবাবু তাদৃশ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। 'বৃত্রসংহারে'র একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে, সর্বোপরি চরিত্র-চিত্রণ আছে। 'পলাশির যুদ্ধে' উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প, গীতি অতি প্রবল। নবীনবাবু বর্ণনায় এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। সেইজন্য 'পলাশির যুদ্ধ' এত মনোহর হইয়াছে।

"এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপি-প্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত-প্রতিঘাত"-দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্য দিকে দুইজনই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বায়রনের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। এই কবিতাগুলির হৃদয়-নিরুদ্ধ ভাব সকল, আগ্নেয়গিরি নিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বায়রন স্বয়ং একস্থানে কোন নায়কের প্রণয়বেগে বর্ণনাস্থলে

নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীনবাবুর কবিতার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

"But mine was like the lava flood
That boils in Etna's breast of flame
I can not praise in pulling Strain
of lady-love and beauty's chain
of changing cheek and scorching vein
Lips taught to writhe but not complain
If bursting heart, and madd'ning brain
And daring deed and vengeful stell
And all that I have felt and feel
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign."

(Byron-Childe Harold)

"নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছ্বলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিঃস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশ-বাৎসল্যের লক্ষণ হয়,—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর এবং তাহার প্রত্যেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে। বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী; বায়রনের ন্যায় তাঁহার শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতারণা করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

"যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বায়রন বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। 'পলাশির যুদ্ধ' যে বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটা কথা বলিব। 'পলাশির

যুদ্ধে'র আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালী হইয়া, বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী-জন্ম বৃথা।" (বঙ্গদর্শন)

এইবার আমরা 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের ভাব-বিশ্লেষণ ও ইহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। বলা বাহুল্য, তাহা করিতে হইলে, সকল শাস্ত্র সংস্কারমুক্ত হইয়া, এই কাব্যেরই অন্তর্গত প্রেরণা লক্ষ্য করিতে হইবে, নতুবা কবির কাব্য রচনা আমাদের পক্ষেই নিস্ফল হইবে। আধুনিক কাব্যবিচারের পক্ষে ইহাই সমীচীন ও সঙ্গত।

৬। কাব্য-প্রেরণা ও কাব্য-বিশ্লেষণ

"মনুষ্য হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও তদ্রূপ। রাবণ ব্যতীত রামায়ণ হইত না। দুর্যোধন ব্যতীত মহাভারত হইত না। কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কোন্ ভাগ বর্জ্জনীয়, কোন্ ভাগ অবলম্বনীয়, তাহা যিনি বুঝিতে না পারেন তাঁহার গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।" —বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রেরও দেশপ্রীতি প্রকাশের আশ্রয়ভূমি ছিল ইতিহাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরেজরচিত দুরভিসন্ধিমূলক বিকৃত ইতিহাসই ছিল নবীনচন্দ্রের উপজীব্য; অপরদিকে তিনি ইতিহাসের তেমন সত্যসন্ধানী গভীর অভিনিবিষ্ট পাঠকও ছিলেন না, তাই সিরাজ-চরিত্র কবির হাতে যথাযথ মর্যাদা পায় নাই। এক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে, he was more sinned against than sinning. 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইবার অনেক পরে—ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা' নামক ঐতিহাসিক উপাখ্যান প্রকাশিত হয় এবং সেই সময় নূতন করিয়া 'পলাশির যুদ্ধের' বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়। মৈত্র মহাশয় স্বয়ং নবীনচন্দ্রকে আক্রমণ করেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের ভূমিকা স্মরণীয়। ভূমিকায় তিনি

লিখিয়াছেন—"আমি উপন্যাস লিখিয়াছি, ইতিহাস নহে।" নবীনচন্দ্রের পক্ষেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে—তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস নয়। 'পলাশির যুদ্ধ' সম্পর্কে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদে নবীনচন্দ্রের প্রতিভার অনুরাগী ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, বাংলার সেই যুগের অন্যতম সংস্কৃতি-গুরু গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন ইতিহাস, আর স্বভাব-কবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন কাব্য—দুইটাতে বিস্তর প্রভেদ। তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় নবীনচন্দ্রই প্রথম গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছেন এবং এই কাব্য লিখিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিষচক্ষে পড়িয়া জীবনে অনেক দুর্গতিভোগ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের নিকট বাঙ্গালী চিরঋণী থাকিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধে' চরিত্র-চিত্রণের অভাববোধ করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে হইবে, মহাকাব্যের বিরাট বিস্তৃতি ও চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রচুর অবসর কবি ইহাতে করিয়া লন নাই। পরাধীনতায় নিরুদ্ধ-কণ্ঠ একটা জাতির ধূমায়িত বেদনাবহ্নি ও বাষ্পোচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি এই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র এবং সেইদিক দিয়া তিনি কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহাই বিচার্য। নবীনচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন, "চরিত্র চিত্রণ করা 'পলাশির যুদ্ধ' রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল না।" তবু তাঁহারই নিপুণ তুলিকায় সৃষ্ট সত্যসন্ধী অকুতোভয় চরিত্ররূপে রাণী ভবানী ও মোহনলাল আমাদের নিকট অপূর্ব আদর্শ হইয়া থাকিবে। রাণী ভবানীর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বরে যে পৌরুষবাণী নির্ঘোষিত হইয়াছে, তাহা সেদিনকার আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মুষ্টিমেয় বাঙালীরই ভাষা—সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী বীরাঙ্গনার কি অপূর্ব অভিলাষ এবং দৃঢ়তা :

> "ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
> নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।

* * *

বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন
চও অগ্রসর, নহে করি পরিহার
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।"

বিদেশী আক্রমণকারীর হস্তে স্বাধীনতা সমর্পণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি গত যুগে জাতীয় ভাবোন্মত্ত বাঙালী যেমন বুঝিয়াছে তাহাই যুগপ্রতিভূ নবীনচন্দ্র রাণীর মুখে প্রকাশ করিয়াছেন :

"বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন।"

বহিরাগত মুসলমান শক্তিও এদেশে বিজয়ীর বেশে আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু বিজেতার স্বাতন্ত্র্য ও উগ্রতা এদেশের মুগ্ধকরী পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ও বহুশত বৎসরের সম্মিলিত সুখদুঃখপূর্ণ জীবনযাত্রার কল্যাণে একান্ত প্রশমিত হইয়া গিয়াছে, এখন হিন্দু-মুসলমান ভারত জননীর অপূর্ব ধূপছায়া বস্ত্রবিশেষ। তাই বিগত যুগে জাতীয় চেতনা, হিন্দু-মুসলমান বিচার করিয়া আসে নাই, দুকূলপ্লাবী বন্যার মত সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরেই আসিয়াছে। নবীনচন্দ্রের রাণী ভবানীর মুখে সেই জাতীয় ঐক্যেরই কথা শুনিতে পাই :

"এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হায় বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব আর্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয়-স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।"

এই কারণেই বলিতেছিলাম, একটা প্রচণ্ড শক্তি, একটা বাধাবন্ধহীন উচ্ছল আবেগ, সমগ্র জাতির দুঃখ শোকে রোরুদ্যমান এক জীবন্ত কবি-হৃদয়ের উষ্ণস্পর্শে 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রতিটি ছত্র সজীব হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বিষয়বস্তুর ত্রুটি সত্ত্বেও উহা বাঙালীর জাতীয় কাব্যরূপে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বায়রনের 'চাইল্ড হেরল্ডের' অনির্বাণ অগ্নিজ্বালা

'পলাশির যুদ্ধে' সঞ্চারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাই নানাস্থানে বায়রনের ভাব ও ভাষার সুস্পষ্ট অনুকৃতি এই কাব্যে দেখা যায়; তবু কবি স্বকীয় ভাব ও কল্পনার স্পর্শে তাহার এমনই রূপান্তর সাধন করিয়াছেন যে, এই অনুকরণে কাব্যগৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূলকথা দেশপ্রীতি। কাব্যের মধ্যে দেশানুরাগ প্রকাশ করা নবীনচন্দ্রের সাহিত্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের রূপ-প্রতিমা গঠনে তাঁহার সজ্ঞান মন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যদ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার রচনায় কাব্যসৌন্দর্য উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে নাই—এ বিষয়ে কবি নিজেই সচেতন ছিলেন। 'পলাশির যুদ্ধ' কবির প্রথম বয়সের রচনা হইলেও, ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার তরুণ-হৃদয়ের স্বদেশপ্রেম এবং অধঃপতিত জাতির জন্য তীব্র বেদনা খুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। নবাব সিরাজের জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন, অথবা চতুর ক্লাইভের বীরপণা কবিকে আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু বাঙালী জাতির ভীরুতা ও মানসিক হীনতা দর্শনে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়াছে। সেই ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও মানসিক হীনতার জন্য বাঙালী যে তাহার স্বাধীনতারূপ দুর্লভ রত্ন হারাইল, উহা কবির অন্তরে তীব্র অনুশোচনার সৃষ্টি করিয়াছে। এবিষয়ে তাঁহার আন্তরিকতা গভীর। স্বাধীনতা হারাইবার জন্য কবির যে দারুণ অন্তর্দাহ, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে 'পলাশির যুদ্ধে'। গ্লানির জন্য ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত কবিহৃদয়ের বাষ্পোচ্ছ্বাসই এই কাব্যের মর্মকথা।

দেশানুরাগের আদর্শের কথা বাদ দিলেও, কাব্য হিসাবে নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' এক অপূর্ব সৃষ্টি! কল্পনার সংযত লীলায় ও বিকাশে, ছন্দের মাধুর্যে ও গাম্ভীর্যে—ভাষার লীলাচাঞ্চল্যে এবং সর্বোপরি বাঙালীর মর্মকথা প্রকাশে এই কাব্য সত্যই হৃদয়গ্রাহী এবং এইদিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বাংলাসাহিত্যে আজিও দ্বিতীয় 'পলাশির যুদ্ধ' রচিত হয় নাই। কবির এই সৃষ্টি এখনও এককভাবে বাংলাসাহিত্যের আসরে দাঁড়াইয়া কবির যশোগাথা কীর্তন করিতেছে।

মধুসূদনের মহাকাব্য কবিপ্রেরণার সৃষ্টি—মধুসূদনে তত্ত্ব নাই, চিন্তা নাই, আছে অবাধ কবিকল্পনার বিকাশ। নবীনচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধে' (এবং অন্যান্য কাব্যে) তত্ত্ব ও চিন্তাকে অপূর্ব কবিত্ব মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যখানির ছন্দ অমিত্রাক্ষর। বাংলার প্রাচীন ছন্দ পয়ারের নূতন ঝঙ্কার ও ধ্বনি আবিষ্কার করেন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন করিয়া। নবীনচন্দ্র ছিলেন ছন্দ-কুশল কবি ; তিনি মধুসূদনের ছন্দের সেই ধ্বনিটিকে ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধে' পয়ারের আশ্চর্যরকম স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতিকে লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন ; আবেগ, গতি ও সৌষ্ঠবে নবীনচন্দ্রের হাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এক নূতন রূপ লইয়াছে। এইখানে তিনি হেমচন্দ্রকে পিছনে ফেলিয়াছেন। স্তবকের আকারে এবং মিত্রাক্ষর ছন্দেও নবীনচন্দ্র মধুসূদনের উদ্ভাবিত কাব্যছন্দকে স্বাধীন গতিলীলায় কিভাবে প্রাণবন্ত করিয়াছেন, তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ' ইহারই নিদর্শন।

বান্ধব সম্পাদক 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"মনুষ্য-জগতে নিখুঁত রূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। নবীনচন্দ্রের এই কাব্যখানিও সর্ব্বাংশে নিখুঁত নহে। তবে একথা অক্ষুব্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। এই কাব্যের বিষয় পলাশির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অথবা নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন এবং বাংলায় ইংরেজের প্রথম অভ্যুদয়। এ দেশীয়েরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ের আদর করিয়া থাকেন, এই কাব্যে তাহা নাই। ইহাতে দেবতা নাই, গন্ধর্ব্ব নাই, দেবাসুরের যুদ্ধ নাই, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা নাই ; জটাচীরধারী তাপসদিগের কঠোর তপস্যার কথা অথবা শৈবাল-সমাবৃতা পদ্মিনীর ন্যায় বল্কলাবৃতা তাপসকন্যাদিগের প্রেম, বিরহ ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতি চিত্তচমৎকারী বিষয়ের উল্লেখ নাই। কিন্তু তথাচ ইহাতে যাহা আছে,

তাহা পাঠ করিবার সময় হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উছলিয়া উঠে এবং কল্পনা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।

'পলাশির যুদ্ধ' বলিলে মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস পুস্তকের কথা আমাদের স্মরণ হয়। কিন্তু যাঁহাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে এবং বুদ্ধি চিন্তামহাযোগে আমাদিগের কবির কল্পনার সঙ্গে উড্ডীন হইতে পারিবে, তাঁহাদিগের নিকট বাংলার কবির বীণার জন্য ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় সম্ভবে না। পলাশির যুদ্ধ বর্ত্তমান ভারত-ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা; পলাশির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি-নেমির এক ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত। ভাগীরথী ও কালিন্দীর ন্যায় দুইটি পুরাণ প্রসিদ্ধ স্রোতস্বতী দুই দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া যেখানে আসিয়া প্রণয়ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, অনেকে ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে সেইস্থানকে তীর্থস্থান বলিয়া পূজা করেন। আবার, সমুদ্রের পূর্ব্বোচ্ছ্বাস প্রবাহসকল যে স্থলে আসিয়া ভৈরবরবে পরস্পর প্রহত হয়, এবং ভয়াবহ তরঙ্গমালা সৃজন করিয়া তটভূমি প্রকম্পিত করে, অনেকে প্রকৃতির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানকে বৈজ্ঞানিকের দৃশ্যস্থান বলিয়া আদর করেন। এই গণনায়, পলাশির ক্ষেত্র মহাতীর্থ ও মহাদৃশ্য। এখানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সম্মিলিত হয়; এখানে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক উন্নতি এই দুই প্রতিকূল স্রোত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও প্রতিঘাত করে; এখানে বংশ-পরম্পরায় সহস্র কোটি লোকের ললাট-লেখার পরীক্ষা হইয়া যায়; এখানে দুই মহাদেশের দুইটি ইতিহাস কালের এক কুক্ষিতে যুগপৎ নিমজ্জিত হইয়া একীভূত নূতন মূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে; এবং বিগত দুইশত বৎসর কাল যাবৎ বাংলা ও ভারতবর্ষে যে পরিবর্ত্তনের চক্র অবিরাম গতিতে অহনিশ চলিয়াছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে এইখানেই তাহা প্রথম চালনা পায়। যদি ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ না থাকিত, তবে এদেশের অবস্থা এখন কিরূপ হইত তাহা চিন্তা করাও কঠিন।"

নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'র ইহাই পটভূমি এবং এই কাব্যখানিতে ইতিহাস যেভাবে কল্পিত হইয়াছে, ত্রুটি সত্ত্বেও তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর

কল্পনার পরিচয় দেয় এবং সমগ্র চিত্রটিকে গ্রহণ করিতে হইলে হিমালয়-শৈলের ঊর্ধ্বতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ভারতের মানচিত্রকে পুনরায় কবির চক্ষে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক হয়, নহিলে 'পলাশির যুদ্ধ' কিছুই নয়। কেবলমাত্র কল্পিত বিষয়ের উচ্চতা, প্রসার ও অতুল গৌরব স্মরণ করিয়াই কবির প্রশংসা করিতেছি না। এই কল্পনায় নবীনচন্দ্রের আর একটি বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্বে পাদক্রম করেন নাই—পরেও কোন কবিকে করিতে দেখিলাম না। তিনি যে 'মণিপূর্ণ খনিতে' সাহস সহকারে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য আলোকবর্তিকা স্থাপন করেন নাই। কাব্য-ক্ষেত্রে এই যে তিনি নূতন পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, এই দুঃসাহসের মূল্যই কি কম? বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির সময় হইতে এদেশে যিনিই যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি একটি পুরাতন অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ পুরান ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়াছেন; কেহ নূতন ফুলে পুরান সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের তাহা হয় নাই। তাঁহার অবলম্বন হৃদয় ও স্বকীয় কল্পনা মাত্র। তাঁহার জন্য বাল্মীকিও মণি বেধ করিয়া যান নাই, এবং কবিকল্পপাদপ ব্যাসদেবও অনন্ত রত্নরাজি সাজাইয়া রাখেন নাই। তাঁহাকে প্রায় সমস্তই স্বহস্তে সঞ্চয়ন ও গ্রন্থন করিতে হইয়াছে। ইহা সামান্য ক্ষমতার কথা নয়। গ্রন্থখানিতে যদিও আধুনিক রীতি অনুসারে একটি বিজ্ঞাপন সংযোজন করিয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কবি আশার সম্বোধনচ্ছলে দ্বিতীয় সর্গের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে মনের বিনয়াচ্ছন্ন অভিমান ও অভিমানাচ্ছন্ন ভয় অতি সুকৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিমানকে ক্ষমা করি. এবং তাঁহার আশা যে দুরাশা নয়, ইহাও বিশ্বাস করি এবং আরও বিশ্বাস করি যে বীণাপানি এই কবির প্রতি প্রসন্নদৃষ্টিতেই চাহিয়াছেন।

'পলাশির যুদ্ধ' অনতিবৃহৎ পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম সর্গে নবাব বিদ্রোহীদিগের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে বৃটিশ সেনার শিবির

সন্নিবেশ, তৃতীয় সর্গে পলাশি-ক্ষেত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে সিরাজদ্দৌলার তখনকার অবস্থার বর্ণনা ইত্যাদি, চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে শেষ আশা বা সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় হত্যা।

প্রথম সর্গের আরম্ভ যেমনই গভীর তেমনই সুন্দর। বোধ হয়, মেঘনাদ-বধের আরম্ভ ভিন্ন বাংলার কোনো কাব্যের প্রারম্ভ বর্ণনাতেই এমন ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য এবং পরিম্লান মনোহারিত্ব দেখান হয় নাই। অভ্রভেদী পর্বত কি অনন্ত বিস্তারিত সমুদ্রের বর্ণনাতে মনে এক গাম্ভীর্যের আবেশ হয়, ইহা তেমন গাম্ভীর্য নয়। কোনো অলৌকিক-রূপ-লাবণ্যবতী নারী, কি মৃদু-বাহিনী নদী, কিম্বা সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্ম প্রভৃতির বর্ণনাতেও উৎকৃষ্ট করিয়া মনোহারিত্ব সৃষ্টি করিতে পারেন। এ-মনোহারিত্ব সে রকমও নয়। যদি কোনো প্রতিভাশালী চিত্রকর বিষাদের মূর্তি আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন এবং সেই মূর্তিতে আতঙ্ক ও আশা এই দুইয়ের বিরোধ এবং শোকের মলিনতা ভাল রকমে ফুটাইতে পারিতেন, তবে তাঁহাকেই ইহার উপমাস্থল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারিত। পড়িবার সময়ে প্রতীতি হয় যেন প্রকৃতি নিজে আসিয়া আজন্মদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখে করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন। আর সমস্ত সংসার ভয়ে, বিস্ময়ে এবং শোকভারে স্তম্ভিত হইয়া অনন্যচিত্তে সেই বিলাপ শুনিতেছে। দিগন্ত-ব্যাপী অন্ধকারের বর্ণনায় কবি একস্থানে বলিতেছেন, "তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল।' সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে, এই ভাবটিকে ভারবির এই শ্লোকটির সঙ্গে অনায়াসে গাথিয়া দেওয়া যাইতে পারে :

"ভবতি দীপ্তির দীপিত কন্দরা
তিমির সংবলিতেব বিবস্বতঃ।"

এই সর্গের মধ্যে কিছু দূরে প্রবেশ করিলে যবন-নিপাতের নিদানীভূত ভারতবিখ্যাত জগৎশেঠের নিভৃত মন্ত্রণাভবন। এই মন্ত্রণাচিত্রে অনুকৃতির কিছু ছায়া আছে। যাঁহারা মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে প্যাণ্ডিমোনিয়ামের সেই লোমহর্ষণ বর্ণনা পাঠ

করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা বিস্ময়কর কি বিচিত্র বোধ না হইতে পারে। পার্থক্য এই যে, 'পলাশির যুদ্ধের' মন্ত্রণাকারীরা রক্তমাংসের মানুষ আর 'প্যারাডাইস লষ্টের' মন্ত্রণাকারিগণ কবিকল্পিত অপদেবতা।

বর্ণনায় কিরূপ প্রশংসনীয় চিত্র-নৈপুণ্য দেখান হইয়াছে তাহা ১১ হইতে ১৫ শ্লোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কূটচক্র মন্ত্রণা-কারীদের প্রত্যেকেই সিরাজদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী ও মর্মান্তিক শত্রু ছিলেন। সিরাজের সর্বনাশ হউক এবং তাহার সিংহাসন এই মুহূর্তেই চূর্ণ হইয়া যাক ইহা প্রত্যেকেরই প্রাণের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কবি অতি সাবধানে, সুকৌশলে, ইহাদের এক একজনের মনের ভাব এক একরূপ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে শব্দনৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রিবর রায়দুর্লভ কপট ধার্মিক। তাঁহার মন কূর্ম-শুণ্ডবৎ—উহা একবার বাহিরে আসে, আবার সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। তিনি কিছুই পরিষ্কার দেখিতে পান না। যেখানে পদনিক্ষেপ করিতে যান, সেখানই তাঁহার কণ্টক ভয়। যাঁহা-দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আসিয়াছেন, তাহাদিগকেও তিনি সম্যক বিশ্বাস করেন না। শেষে, এইরূপ লোকের যেমন হইয়া থাকে, মনের কথা মনে রাখিয়া ইহার এবং উহার মুখের পানে চাহিয়া থাকেন। তাহার পর জগৎশেঠ অকপট, অসন্দিগ্ধ চিত্ত, অটল সাহসপূর্ণ এবং অভিমান বিষে জর্জরিত! শেঠবরের হৃদয়ের ক্রোধ আগ্নেয়গিরি মত, উহা হইতে যাহা কিছু বাহির হয়, তাহাই শ্রোতার অঙ্গে অঙ্গে তপ্ত লোষ্ট্র সম' নিপতিত হয়, কথায় ধমনীতে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়।"

জগৎশেঠের প্রতিজ্ঞাও ভীমের মত, শুনিলেই হৃদয় চমকিয়া ওঠে এবং যেন এতক্ষণ পরে পুরুষের সম্মুখে আসিয়াছি, এই রকম বিশ্বাস জন্মায়ঃ

"সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রমা
অসম্ভব, হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা
সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো নক্ষত্র মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র, পাতি বক্ষঃস্থল।"

রাজনগরেশ্বর মহারাজ রাজবল্লভের কথায় বিষের মিশ্রণ আছে, তড়িৎ-বেগ নাই; কথা যেন ফুটি ফুটি করিয়াও দুঃখ ভরে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ যে অস্ফুট কথা, তাহাতেও

... ... উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করে মিরজাফরের হিয়া।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্মিক, পাপদ্বেষী, পবিত্র ও পরদুঃখকাতর। তিনি যখন আলিবর্দির অকলঙ্ক চিত্রপটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিরাজের কলঙ্ক-মলিন প্রতিমূর্তি নিরীক্ষণ করেন, তখন ঘৃণায় তাঁহার আত্মা জর্জরিত হয়। কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কূট-ভাষীও নহেন। তাঁহার পরামর্শ স্পষ্ট কথা। চক্রীদিগের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই চক্রান্ত নাই। এই মন্ত্রণাকারীদের মধ্যে রাণী ভবাণীর উক্তি সত্যই মর্মস্পর্শী। যিনি সেই অমৃতে মাখানো বিষ, কি বিষাক্ত অমৃত পান করিবেন, তিনিই কবিকে সাধুবাদ না দিয়া পারিবেন না। যদি কোনো ব্যক্তি সুগভীর নিদ্রার মধ্যে সহসা কোনা অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া জাগিয়া বসেন, তাঁহার চিত্ত যেমন নানাবিধ অচিন্তনীয় ভাবে সেই সময়ে আলোড়িত হয়, এই কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে দ্বিতীয় সর্গে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র পাঠকের অসাবধান চিত্তও সহসা সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে।

প্রথম সর্গের সমস্ত কথাই নিশার দুঃস্বপ্নের মত অলীক বোধ হয়; অথবা, অন্ধকার-রজনীতে অকস্মাৎ মেঘ-গর্জন শুনিয়া কিংবা অকস্মাৎ

বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ী চমক দেখিলে তাহা যেমন শ্রুতি কি দৃষ্টির বিভ্রম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ যাহা কিছু শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই যেন মনের ভ্রান্তি, এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে প্রবেশ করিলেই সেই প্রীতিকর ভ্রম ও প্রিয় বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়, এবং যাহা দেখি নাই তাহা শুনিয়া, মন বিশ্বাসের পর ভয়ে, এবং ভয়ের পর বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও সঙ্কুচিত হয়। কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় বাংলাদেশ! কিন্তু এখন কি শুনি, আর কি দেখি! না—

"বৃটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্‌ঝম্
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চালন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্,
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া-মন্ত্র-বলে; কভু অস্ত্র করে;
কভু স্কন্ধে; ধীরপদে: কভু দ্রুতগতি।
ড্রুমের ঝর্ঝর রব, বিপুল ঝঙ্কার
বিজ্ঞাপিছে বৃটিশের বীর অহঙ্কার।"

এই সর্গে সমরোন্মুখ সৈনিকদিগের মনের ভাব আঁকিতে যাইয়া কবি মাঝখানে আশার যে একটি বন্দনা করিয়াছেন, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকিবে। এই বন্দনাটিকে স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেলের 'আশা' নামক কবিতার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে পাঠকগণ আনন্দ পাইবেন। ক্যাম্বেলের আশা পৃথিবী ছাড়িয়া ঊর্ধ্বতম গগনে বিচরণ করে; নবীনচন্দ্রের আশা স্নেহগদ্গদ প্রিয় কণ্ঠের ন্যায় হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরণ করিয়া প্রাণমন কাড়িয়া লয়। যিনি বৃটিশ-সেনার প্রাণ, পলাশির যুদ্ধের যিনি প্রধান নায়ক, সেই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ক্লাইবের সঙ্গে এতক্ষণ কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কোথায় ছিলেন, বাংলায় কেন আসিলেন এবং এখানে

আসিয়াই বা আজ কি কারণে কাটোয়া শিবিরে গাছের তলায় একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কবি কাব্যের প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রথমে তাহার কিছুই বলেন নাই ; কিন্তু আশার নিকট জিজ্ঞাসাচ্ছলে যেভাবে ক্লাইবকে সহসা অভিনয় ভূমিতে আনিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে। এইরূপ পটপরিবর্তনে মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠে, এবং উত্তরোত্তর চিত্রগুলি দেখিবার জন্য মন স্বভাবতঃই উৎসুক হইয়া উঠে। ক্লাইবের সেই সময়কার মুখচ্ছবি এবং মনোগত ভাবের বর্ণনা সম্পূর্ণ না হইলেও নিখুঁত। ক্লাইবের চক্ষু এবং দৃষ্টির প্রতি তিনি যতখানি মনোযোগ দিয়াছেন, ততখানি মনোযোগ তাহার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনায়, তাহার বসিবার ভঙ্গি-বর্ণনায় যদি দিতে পারিতেন, তাহা হইলে চিত্রটি সম্পূর্ণ হইত।

ক্লাইবের মনোভাবের বিশ্লেষণে কবি কিন্তু কোনো ন্যূনতা রাখেন নাই। যখন ক্লাইব সংশয়-দোলায় দুলিয়া আশার হিল্লোলে একবার উপরে উঠিতেছেন এবং পরিণাম চিন্তায় আবার বিষণ্ণ হইয়া ভূতলে পড়িতেছেন ; যখন সম্পদ ও বিপদ, বিজয় ও পরাজয় এবং কীর্তি ও অকীর্তির বিভিন্ন মূর্তি তাঁহার কল্পনানেত্রে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহার মনের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে ; এবং যখন অপমানের বৃশ্চিক দংশন, লোভের অঙ্কুশতাড়না এবং অভিমানে প্রদীপ্তবহ্নি তাঁহার চিত্তকে এক অনির্বচনীয় উৎসাহে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় মূর্তিমতী সিদ্ধি কি জয়শ্রীর ন্যায় দিব্যমূর্তি এক নারীর আবির্ভাব কবি কল্পনার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। কাব্যের পক্ষেও ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

'পলাশির যুদ্ধে'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ দ্বিতীয় সর্গ সম্পর্কে লিখিয়াছেন : "যদি কল্পনার উচ্চতায় এবং চিত্রগত কারুকার্য্যের চমৎকারিতায় আত্মাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারিলে কাব্যের প্রশংসা হয়, তবে এ অংশটি (দিব্যমূর্ত্তি নারী-চরিত্র বর্ণনার অংশ) কতদূর প্রশংসনীয় তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। প্রাচীনতার প্রতি অন্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষপাতশূন্য

হৃদয়ে বিচার করিলে, এই কবিতা কয়টির তুলনাস্থল অল্প আছে। যখন সেই জ্যোতির্ম্ময়ী বরবর্ণিনী বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সাধক সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তখন তিনি তাহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়া, যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে বিধাতার অঙ্কিত 'ভারতবর্ষের ভাবী মানচিত্রখানি' দেখাইতে লাগিলেন।"

দ্বিতীয় সর্গের শেষে একটি গান। বৃটিশ সৈনিকগণ ঐক্যতানের সহিত গাহিতে গাহিতে গঙ্গাপার হইতেছে, আর তালে তালে আঘাতে আঘাতে, গঙ্গার জলরাশি লহরী লীলায় নামিয়া উঠিতেছে। এখানে কবি একেবারে গীতি-কবিতার স্তরে নামিয়া আসিয়া আসিয়াছেন। 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমরা এখানে অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি: "এরূপ গীতে শুধু আমোদ নহে উপকারও আছে। যেমন একজনের গীত শুনিলে আর একজনের গাহিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ একজাতির জয়গাথা শ্রবণ করিলে আর এক জাতির হৃদয়ও গাহিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে।...সিংহল-বিজয়ের সময়ে বাঙ্গালী একবার এই গীত গাহিয়াছিল।...বাঙ্গালী আবার যদি কোনো দিন এইরূপ গীত গাহিয়া জলস্থল নিনাদিত করিতে পারে তাহা হইলে সেই বঙ্গভারতী বিমানে থাকিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। ইহা একটি অবধারিত কথা যে, কাব্যের প্রধান পরীক্ষাস্থল পাঠকের হৃদয়। তার্কিকের ভাষা, সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া বুদ্ধিকে সম্বোধন করে; কবির কণ্ঠলহরী, তর্কের কুটিল পথে পরিভ্রমণ না করিয়া, একেবারে গিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে স্পৃষ্ট হয়। সুতরাং যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে—শ্রোতা কি পাঠকের হৃদয় নিহিত নিদ্রিত ভাবসমূহকে উদ্বোধিত করিয়া দেয়, সেই কাব্য সেই পরিমাণে কৃতার্থতা লাভ করে। আর যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়কে স্পর্শ করিতে অথবা হৃদয়ের নিকটস্থ হইতে অসমর্থ থাকে, সেই কাব্য সেই পরিমাণে অকাব্য মধ্যে পরিগণিত হয়।"

এই প্রসঙ্গে পোপ ও বায়রনের দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পোপের কবিতা পড়িবার সময় পাঠকের মনে হইবে তিনি যেন একজন সাবধানী কবির কবিতা পাঠ করিতেছেন। উত্তরোত্তর কথার গাঁথনিতে সাবধানতা, ভাবের সমাবেশে শব্দ বহু পরীক্ষার পর গৃহীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ভাব শতবার শোধিত হইয়া কবির হৃদয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। বায়রণের কবিতায় এই সাবধানতার লেশমাত্র নাই। উহা রাত্রির বংশীধ্বনির মত, অথবা বায়ু বিক্ষোভিত নদীর বিলাপ-ধ্বনির মত। শুনিবামাত্রই চিত্ত পাগলের ন্যায় নাচিয়া উঠে। কি শুনিলাম, কে শুনাইল, ইহা বিচার করিবার অবকাশ থাকে না। প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে কেবল এই মাত্র বোধ থাকে। এই দুই কবির শক্তির এই যে তারতম্য, ইহার কারণ পোপ বুদ্ধির কবি, বায়রন হৃদয়ের কবি; একজন পিঞ্জরাবদ্ধ গৃহশুক, অপরজন প্রমত্ত বন-বিহঙ্গ। যিনি বুদ্ধির কবি তাঁহার সেই সুমার্জিত ও সুসঙ্গত কথা শ্রুত হইয়াও অশ্রুত থাকে, অর্থাৎ কানে যায়, মর্মে প্রবেশ করে না। যিনি হৃদয়ের কবি, তিনি বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া মনের সুখে কি মনের দুঃখে হৃদয়ের গান গাহিয়া থাকেন। কিন্তু সেই বন্য সঙ্গীত বিশৃঙ্খল হইলেও হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, এবং এক তানে শত তান সৃষ্টি করে।

'পলাশির যুদ্ধ' এই শ্রেণীর কাব্য। ইহা হৃদয়-রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে এবং ইহার প্রত্যেক সর্গে, প্রত্যেক লাইনে একটি সজীব হৃদয়ের পরিচয় আছে। তাই, বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কবিতাকে বায়রনের কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সেই দৃক্‌পাতশূন্য বন্যভাব, সেই অদ্ভুত মাদকতা 'পলাশির যুদ্ধে'র অনেক স্থানেই পরিলক্ষিত হয়। কোনো কৃত্রিম কবির পক্ষে কখনো 'পলাশির যুদ্ধ' রচনা করা সম্ভব হইত না। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাই বলেন: "ইহার লেখকের হৃদয়ে চির-বসন্ত, চির-যৌবন। তাঁহাতে বার্দ্ধক্যের জড়তা নাই, চিন্তাপরায়ণের সাবধানতা নাই এবং ভাবিয়া ভাবিয়া পদবিন্যাসের অবকাশ নাই। কিন্তু লেখা তথাপি হৃদয়-

স্পর্শিনী।” তৃতীয় সর্গের প্রথম কয়েকটি লাইন হইতে পাঠক বুঝিবেন, নবীনচন্দ্রকে কেন অসাবধান বলি, এবং অসাবধান বলিয়াও কেন অকৃত্রিম কবি বলি।

তৃতীয় সর্গে কবি কল্পনাযোগে পলাশির ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উপস্থিত হইয়াই চিন্তাবশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই। হৃদয়ে গভীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে এবং শোকবশে দুই চোখ দিয়া দরবিগলিত ধারায় নিঃশব্দে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু যে মোগলের জন্য এই দুঃখ, তাহাকেই আবার ‘পাপাত্মা’ ও ‘যবন’ বলিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। পাঠকের মনে আবার প্রশ্ন জাগে, সেই পাপাত্মা যবনের নিপাতে বাঙালী হিন্দুর দুঃখই বা কি ? এইভাবে পাঠকের চিত্ত যখন বিবিধ প্রশ্নে বিলোড়িত হইতেছে এবং কবি কল্পনার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মীমাংসার অনুসন্ধান করিতেছে, ইহার মধ্যেই সহসা অন্য কথা। কোথায় কোটি-কল্প লোকের অদৃষ্টের ফলাফল গণনা, আর কোথায় রূপসীদের রূপের তরঙ্গ! কবি যেই ভারতের ভাগ্যসূত্র হাতে ধরিয়া নবাব-শিবিরের বিলাসগৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সকল কথা বিস্মৃত হইয়া সেই বিলাসতরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন। ইহা যেন এক গানের মধ্যে আর এক গান, এক রাগিণীর মধ্যে আরেক রাগিণী। ইহাই নবীনচন্দ্রের অসাবধানতা।

কিন্তু কবির এই অসাবধানতার সমর্থনে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেন: “এই অসাবধানতার মধ্যেও স্বভাবের কি চমৎকার শোভা রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য সহৃদয়তাই প্রকাশিত হইয়াছে। তরঙ্গের পৃষ্ঠে তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেল হৃদয় সমুদ্রে মুহুর্মুহু ভাব-পরিবর্ত্তন হইতেছে ; আর আত্ম-বিস্মৃত কবি সেই সমস্ত চঞ্চল ভাবকে বর্ণ-তুলিকা লইয়া অবিরাম চিত্রিত করিতেছেন। মনের এই অবস্থায় কি কখনো সাবধান হওয়া সম্ভবপর হয় ? অথবা তর্কশাস্ত্রকে প্রবোধ দিবার জন্য অত সাবধান হইয়া চলিলে,

কবিতা কি কখনো চলসৌদামিনীর মত এরূপ স্ফূর্তিমতী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া থাকে?”

কবি এই সর্গে আরেকটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন? নারীর রূপ বর্ণনায় এবং হাবভাব লীলারঙ্গ এবং বিলাস বিভ্রমের বর্ণনায় প্রায়ই মানুষের চিত্ত তরলিত হয়। কিন্তু এই সর্গে এইসব বর্ণনা পাঠ করিবার সময়েও চিত্ত তরলিত না হইয়া যেন কি দুঃখে, বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে; অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে রৌদ্রের বিষাদ-মাখা হাসির ন্যায়, অথবা প্রভাতের নিভু নিভু দীপশিখার ন্যায়, পাঠকের চক্ষে সমস্তই নিরাপদ আনন্দের মূর্তি ধরে! সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্ধ ভক্তেরা আদিরসকে করুণরসের নিত্য-বিরোধী বলেন। যিনি আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরকম কারুণ্যের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার কাব্যে ত্রুটি থাকিলেও, তাঁহার কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়।

‘পলাশির যুদ্ধে’ চতুর্থ সর্গ বাঙালি মাত্রেরই অভিমানের বিষয়। বাংলা কাব্যসাহিত্যে এমন জিনিস খুব বেশী নাই। ইহার যে অংশই পাঠ করা করা যায়, সেই অংশেই মোহিত ও পুলকিত হইতে হয়; এবং যতবার পড়া যায়, ততবারই নূতন আনন্দ পাওয়া যায়। কি রস, কি রচনা, সর্বাংশে ইহা মাদক ও মনোহর। যখন ভয়ব্যাকুলিত নবাবসৈন্যগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া ইতস্তত: ছুটিয়া পলাইতে লাগিল, তখন কবি মোহনলালের মুখে যেসব কথা দিয়াছেন, তাহার বীরত্বব্যঞ্জক আবেদন সত্যই অতুলনীয়। ইহার পর পুনরায় যুদ্ধ, যুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা এবং নবাবের পরাজয় ও পলায়ন; কবি সেই সময়ে কল্পনানেত্রে অস্তাচলগামী সূর্যের প্রতি চাহিয়া যে কথা বলিয়াছেন, ভারতবাসীর অশ্রুজল ভিন্ন তাহার আর প্রতিদান সম্ভবে না। প্রিয়-বিয়োগ-বিধুর নারীকণ্ঠের বিলাপ শুনিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই প্রাণ এমন আলোড়িত হয় নাই। যদি এই কথাগুলি কবির মুখ নিঃসৃত না হইয়া স্বদেশবৎসল মোহনলালের মুখে দেওয়া হইত, তবে আর কোনো কথাই ছিল না।

পঞ্চম সর্গে মিরজাফরের সিংহাসনে অভিষেক এবং সিরাজাদ্দৌল্লার নিধন। কবি এই সর্গটিকে ‘শেষ আশা’ নাম দিয়াছেন। (আশার নির্বাণ আরও উপযুক্ত হইত) এখানেই সকলের আশা ফুরাইল, প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়া গেল। ভাবের তুলনায় এই সর্গের সমস্ত অংশ সমান হৃদ্য হয় নাই, কিন্তু এক একটি স্থান অতি আশ্চর্য। কখনো দুঃখে গলিয়া পড়িতে হয়, কখনে ভয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। যখন মিরণের জনৈক পাপসহচর কারাগারে গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সিরাজের কাছে আসিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিবার জন্য হাতে খড়্গ তুলিয়াছে, তখন কবির উপদেশের মধ্যে হতভাগ্য নবাবের প্রতি তাঁহার যে সমবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সত্যই মর্মস্পর্শী।

‘পলাশির যুদ্ধে’র ভাষা সুন্দর। যেকালে ইহা রচিত হয়, তখনকার দিনের তুলনায় এমন সরস, সরল ও সুখপাঠ্য কবিতা সত্যই বিস্ময়ের জিনিস ছিল। তখনকার দিনের বিদগ্ধ সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাই ‘পলাশির যুদ্ধের’ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, “আমাদিগের বিবেচনায় ইংরাজি ভাষার সঙ্গে ওয়াল্টার স্কটের যে সম্বন্ধ, বাংলা ভাষার সহিত ‘পলাশির যুদ্ধ’ কাব্যের সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তবে কবিবর নবীন চন্দ্র ইংরাজি ভাষার প্রাণগত রসকে বাংলায় ঢালিতে গিয়া স্বজাতির যেমন কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তেমনি দুই একটি অপরাধও করিয়াছেন। যথা—‘পাড়া প্রতিবাসী ত্রাস’, ‘চিৎ হ’য়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান’ ইত্যাদি। গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট এইরূপ এক একটি পংক্তি দুগ্ধকুম্ভে গোময় নিক্ষেপের মত এক একটি মনোহর কবিতাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু কবি কিছু পরেই এমন একটি সুধানিঃস্যন্দিনী কবিতা বঙ্গভারতীর কণ্ঠে তুলিয়া দিয়াছেন যে, দেখিয়া তাঁহার সকল ত্রুটি বিস্মৃত হইতে হয়।”

নবীনচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে সেই সময়কার ‘সাধারণী’ সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন : “নবীনের ললিত কণ্ঠ, কোমল আওয়াজ, বাঁধা বীণায় জমাট সুর। এ আওয়াজ, এ সুর, আর এ সুরের ওস্তাদী আলাপ,

বড় মধুর, বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই মদিরাময়। কানের ভিতর দিয়া নবীনের আওয়াজ প্রাণে পৌছে।...প্রশান্তে প্রখরে, উজ্জ্বলে মধুরে, গম্ভীরে সুন্দরে, বেমালুম মাখামাখি,—সুখে শোকে সৌন্দর্য্যভরা নবীনের আবেগময়ী আনন্দময়ী কবিতা।......ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, একখণ্ড উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাংলার সাহিত্যকাশে সমুদিত হইয়াছে।"

বাস্তবিকই 'পলাশীর যুদ্ধে'র প্রধান গুণই হইল মাদকতা। বীরত্বব্যঞ্জক কবিতার পাশে ললিত পদাবলীর অভাব নাই। যেন লেখনী অবিরত মুক্তাফল প্রসব করিয়াছে। তবে অনুকরণের অপবাদ অনেকে নবীন চন্দ্রকে দিয়া থাকেন। কাব্যজগতের চিরন্তন নিয়ম ইহাই যে উত্তর-স্বরিগণ সব সময়েই পূর্বস্বরিদের অনুকরণ করিয়া থাকেন—কেহ ভাবের, কেহ ভাষার। সিরাজদ্দৌলার বিকট স্বপ্নদর্শনে সেক্সপীয়ারের তৃতীয় রিচার্ড নামক নাটকের স্বপ্নদর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত বহিয়াছে; চাইল্ড হেরল্ডের তৃতীয় সর্গের কয়েকটি কবিতায় নৃত্যগীতের যেরূপ বর্ণনা আছে, 'পলাশির যুদ্ধে' কোনো কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে, এবং বায়রন ও স্কটকে আরও অনেকস্থলে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহা দোষের নহে। দোষ অথবা অপূর্ণতার কথা বলিতে হইলে 'পলাশির যুদ্ধে'র বিশেষ দোষ কিংবা অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে চরিত্র চিত্রণ একেবারেই নাই। ফলে, সমগ্র কাব্যখানি পাঠ করিবার পর মনে কতকগুলি সুন্দর ভাব এবং সুন্দর বর্ণনা ভিন্ন আর কিছু মনে থাকে না। ভাল কি মন্দ, কোনো একটি চরিত্র নবীনচন্দ্র আঁকিতে পারে নাই।

(৭) কবি-মানস ও কাব্য-বিচার

'পলাশির যুদ্ধ' ঠিক কাব্য নয়, ইহাকে ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য বলাই সঙ্গত। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ইহা প্রকাশের পর নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'পলাশির যুদ্ধের' প্রতিকূল সমালোচনা শুরু হয় এবং 'পলাশির যুদ্ধের' খ্যাতিও কিছুটা ম্লান হইয়া পড়ে। কিন্তু নানা প্রতিকূল সমালোচনা নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতিকে স্পর্শ করে নাই, কারণ, তাহার পরও তিনি সাতখানি ছোটবড় কাব্য রচনা করেন এবং তাহা সমাদৃত হয়—বিশেষ করিয়া তাঁহার কাব্যত্রয়ী—রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস।

আমরা ইতিপূর্বে ইহাও আলোচনা করিয়াছি যে 'পলাশির যুদ্ধের' পরিকল্পনায় স্থানে স্থানে বায়রনের পরোক্ষ প্রভাব আছে। কেবলমাত্র 'পলাশির যুদ্ধ' নয়, সেই সময়ে লেখা তাঁহার বহু কবিতায়ও বায়রনের প্রভাব আছে। কাব্যখানি দশ পয়ার-ছত্রবিশিষ্ট স্তবকে রচিত। ইহা দেশীয় রীতি নয়; ইংরেজি স্পেনসরীয় স্তবকের অনুকরণ। চরিত্র কল্পনার বৈশিষ্ট্যের অভাবেই সমগ্র কাব্যখানি প্রাণহীন। তাহার উপর লিরিক উচ্ছ্বাস কাব্যের প্রধান স্থান অধিকার করায়, কাব্যের আবেদন সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠিতে পারে নাই। ছন্দের লালিত্য, রচনা-রীতির গুরু-চণ্ডালী দোষে তাহার মাধুর্য হারাইয়াছে।

তবে এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও 'পলাশির যুদ্ধ' বাঙালির এত প্রিয় কেন? ইহার উত্তরের জন্য আমাদিগকে নবীনচন্দ্রের কবি-মানসের দিকে একবার দৃষ্টি দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেন বলেন: "রঙ্গলাল হেমচন্দ্রের ভারতের স্বাধীনতা-হীনতার ক্ষেত্র মুসলমান-শাসনের পটভূমিকায় জনান্তিকে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। পলাশির মাঠে ইংরাজের কাছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা বিনাশ তখনকার শিক্ষিত যুবকদের মনে যে ধিক্কার জাগাইতে শুরু করিয়াছিল, কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রকাশ হইল নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'। অবশ্য নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সিরাজদ্দৌলার সমর্থন করেন নাই। কেননা তখনও সিরাজের ইতিহাস একতরফাই জানা ছিল। নানা কারণে ক্লাইবের বিপক্ষে কিছু বলাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নবীনচন্দ্র মোহনলালকে তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়া

দুই দিক বাঁচাইয়াছেন। রাজপুত-ইতিবৃত্তের বকলম এড়াইয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে দেশের পরাধীনতার যে মর্ম্মবেদনা ধ্বনিত করিলেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্টতার পরিচায়ক।"

'পলাশির যুদ্ধের' সমগ্র কল্পনা উজ্জীবিত হইয়াছে স্বাধীনতার-অগ্নিমন্ত্রে —সেই মন্ত্র তিনি পাইয়াছিলেন তখনকার পরিবেশের মধ্যে। এই কাব্যের রচনাকালে আমাদের স্বাধীনতার উন্মেষমাত্র হইয়াছে। কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের আঠারো বছরের মধ্যে ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের নিগড় ভাঙিতে চাহিয়াছে। এই প্রেরণা রাজনৈতিক কারণে দেশের মাটিতে জন্মলাভ করিলেও, লোকের মনের মধ্যে ইহাকে স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছেন বাংলার কবিরা। সেই কবিগণের মধ্যে নবীনচন্দ্রের সুর যে বলিষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার কবি-মানসে বায়রনের প্রভাবের জন্যই তিনি ভারত ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যে কাব্যের যে উপকরণ পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া এক পরীক্ষা করেন। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু নবীনচন্দ্র সাহস করিয়া বিষয় নির্বাচনে নূতন পথে পদক্ষেপ করেন। কতকটা আত্মসচেতন হইয়াই তিনি যে এই কাব্য-নির্মাণ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এবং তাঁহার কবি-মানসের বলিষ্ঠতার একান্ত আশ্রয় ছিল স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ। একটা মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কবি তাই স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে প্রাণের কথা আবেগের সুরে বলিয়াছেন—যে আবেগে বায়রনের কবিতা সৃষ্ট হইয়াছিল।

নবীনচন্দ্রের কবি-প্রকৃতি শৈশব ও কৈশোরে বিকশিত হইয়াছিল চট্টগ্রামের পার্বত্য-পরিবেশের মধ্যে। কঠিন ও সুন্দর সেই পরিবেশ তাঁহার কবি-মানসে তাই ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সেই বলিষ্ঠতা তরল লিরিক উচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল, তাই স্বাধীনতার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস তাঁহার কল্পনাকে বেগপ্রবণ করিয়া তুলিলেও,

ইহার অভিব্যক্তিকে সর্বত্র সমানভাবে প্রাণবাণ করিয়া তুলিতে পারে নাই। তথাপি নবীনচন্দ্রের কবিমানসের অন্তরালে থাকিয়া স্বাধীনতা যে অগ্নিক্ষরা প্রেরণা ভাষায় রূপ পাইয়াছে, রাণী ভবানী ও মোহনলালের আবেদনই ইহার দৃষ্টান্তস্থল, তাহা যে 'পলাশির যুদ্ধ'কে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা, স্বতন্ত্র গৌরব দিয়াছে, তাহাতে কোন ভুল নাই। দেশাত্মবোধের এমন সার্থক সুর কোনো বাঙালি কবির কাব্যে আমরা শুনিতে পাই নাই। তাই এই কাব্য খানিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার কবিকীর্তি আজও অম্লান রহিয়াছে—সম্ভবত চিরদিন থাকিবে।

প্রকৃত ঐতিহাসিক কাব্য বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। নবীনচন্দ্রের পূর্বসূরি রঙ্গলাল যদিও রাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনাদের চরিত্র ও কাহিনী লইয়া ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিল, তাহা আমাদের কাছে অনেকটা পৌরাণিক কাব্যের মত। 'পলাশির যুদ্ধ' বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত, এজন্য সহজেই বাঙালির অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। স্বর্ণলঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধ কিম্বা রাজপুতনায় পদ্মিনীর জহরব্রত বহুদূরস্থানে সংঘটিত ঘটনা এবং বহুদিন পূর্বে সেগুলি ঘটিয়াছে। দেশ ও কালের দূরত্ব বিচারে 'পলাশির যুদ্ধ'কে আমাদের বাড়ীর দুয়ারে সংঘটিত সেদিনের ঘটনা বলিতে পারি। এই রকম একটি ঘটনাকে লইয়া কাব্য রচনা করা সহজ নয়। কারণ, দেশে ও কালে কতকটা দূরে কাব্যের ঘটনা যদি না ঘটে তাহাতে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা কঠিন। নবীনচন্দ্রের কবি-মানসে এমনই একটি উপাদান ছিল যাহার সাহায্যে তিনি এই কঠিন কাজ অনায়াসে করিতে পারিয়াছেন। স্বাধীনতা-প্রিয়তার এই উপাদানেই তাঁহার কবি-প্রতিভা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। এই স্বাধীনতা প্রকৃতি হইতে এবং কতকটা বায়রন হইতে তিনি পাইয়াছিলেন।

এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম কতখানি সংকীর্ণতামুক্ত। দেশ তখন মুসলমানদের পরাধীন। দেশ বলিতে

নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বাঙ্গালী হিন্দু-অধ্যুষিত বাংলাদেশই বুঝিতেন এবং স্বাধীনতা বলিতে হিন্দুর স্বাধীনতা বুঝিতেন। তাই সিরাজের পতনে কবির কোনো বেদনা নাই। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে মুসলমান নবাবের সিংহাসন চ্যুতির প্রয়োজন কবি যেমন মনে করিতেন, তেমনি তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, ইংরেজের রাজ্যজয় দেশের পক্ষে দারুণ অনর্থের বিষয় হইবে। এই ভাবটিই তিনি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

"শীতলিতে নিদাঘের আতপ জ্বালায়
অনল শিখায় পশে কোন মূঢ় জন?"

মুসলমানের শাসনে থাকিলে একদিন স্বাধীনতালাভের আশা ছিল, কিন্তু ইংরাজ শাসনে কোনো আশাই নাই—এই চিন্তাই তাঁহার কবি-চিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। কিন্তু কবির দেশাত্মবোধের মধ্যে এমন ভাবও ফুটিয়াছে যেখানে তিনি হীন ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন। তাঁহার মতে ইংরেজ বণিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া অবাঞ্ছিত সিরাজেরও সর্বনাশসাধন দেশাত্মবোধের পরিচায়ক নয়। ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা। কবির মনের এই কথা রাণীর মুখ দিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন :

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল,
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ।
... ...
অশ্বত্থ পাদপ জাত উপবৃক্ষ মত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

নবাবী আমলে শাসনকার্যের সর্বত্র হিন্দুর প্রাধান্যে কবি উল্লসিত; তাই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কবির মনোভাব রাণীর মুখ দিয়া এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল :

"আমাদের করে রাজ্যশাসনের ভার।
কিবা সৈন্য রাজকোষ রাজমন্ত্রণার
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে, শিবিরে হিন্দু প্রবল সহায়।
অচিরে যবনরাজ্য টলিবে নিশ্চয়
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।"

তখনকার রাজনীতিক পরিবেশের কথা, বাঙালির নবজাগরণের অভীপ্সা, একান্ত সংকীর্ণতার কথা মনে রাখিলে নবীনচন্দ্রের এই মনোভাবকে আমরা সমর্থন করিতে পারি। দেশ ও কালের সীমা ছাড়াইয়া তিনি দেশবাৎসল্যের পরিচয় যদি দিতে পারিতেন তাহা হইলে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য অনায়াসে কালোত্তীর্ণ হইতে পারিত। তাহা হয় নাই বলিয়া নবীনচন্দ্রের ভারত-উদ্ধার—মুসলমানদের হাত হইতে হিন্দুদের ভারত-উদ্ধার। রাণী ভবানী যাহা বলিয়াছেন তাহাই কবির স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ :

"আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোসিযা অসি
সাজিয়া সমর সাজে নৃপতি সমাজ
প্রবেশ' সম্মুখ রণে, যেন পূর্ণশশী
বঙ্গ স্বাধীনতাধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শতবৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ।"

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, কাব্যের মধ্যে দেশানুরাগ প্রকাশ করা নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূলকথা। 'পলাশির যুদ্ধে' যাহার উন্মেষ, পরবর্তী কাব্যগুলিতে তাহাই একটি সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া 'পলাশির যুদ্ধে'র মধ্য দিয়া কবির স্বদেশপ্রেম অধঃপতিত বাঙালির জন্য তীব্র বেদনাবোধের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। সিরাজ কি ক্লাইব কেহই তাঁহার প্রতিভাকে আকৃষ্ট করে নাই। বঙ্কিমের ভাবধারায় পুষ্ট ও সমসাময়িক নবজাগরণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নবীনচন্দ্রের

হৃদয় শুধু বাঙালির ভীরুতা ও মানাসক হীনতায় ব্যথিত হইয়াছে। বাঙালি তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছে এই ভীরুতা ও মানসিক হীনতার জন্য। স্বাধীনতাপ্রিয় কবি পরাধীনতার গ্লানিতে পীড়িত। 'পলাশির যুদ্ধে' তিনি মনের সেই ব্যথাকেই ভাষা দিয়াছেন। তাই একমাত্র মোহনলালকেই কাব্যের নায়করূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের মুখ দিয়া কবির নিজেরই প্রাণের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, 'পলাশির যুদ্ধে' মোহনলালই একমাত্র সিংহ, বাকী সকলেই ভীরু কাপুরুষ। প্রভুভক্ত মোহনলালকে কবি আদর্শ দেশভক্ত বীর হিসাবে আঁকিয়াছেন। মোহনলালের বেদনা মুসলমানের পতন হইল বলিয়া ততটা নয়, যতটা ইংরেজের বিজয়ে হিন্দুর —বাঙালি হিন্দুর—আশাভরসাও ফুরাইল বলিয়া।

যুদ্ধক্ষেত্রে বীর মোহনলালের গর্জন—বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও নবাব-সেনার প্রতি তাহার তীব্র তিরস্কার পাঠকের চিত্তে সহজেই রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। এইখানেই নবীনচন্দ্রের স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগময়ী কবিতা রসোত্তীর্ণ হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। আমরা যখন সেই বীর কণ্ঠের গর্জন শুনি :

"দাঁড়া রে! দাঁড়া রে! দাঁড়া রে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ
... ...
আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।
... ...
নিশ্চয় জানিও রণে হ'লে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল-ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর
অধীনতা-বিষে হবে জীবন সংশয়।"

তখনই আমরা বুঝিতে পারি, পরাধীনতার দুঃখ ও গ্লানি যে কত দুঃসহ, রাজকর্মচারী হইয়াও, নবীনচন্দ্র তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। যুদ্ধে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল—বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইল। অস্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত মোহনলালের সকরুণ বিলাপ যেন সমগ্র জাতির অন্তরের কথা :

> "কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ
> বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি।
> তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন
> আসিবে যবন-ভাগ্যে বিষাদ-রজনী!

'পলাশির যুদ্ধে' কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ও আছে। কবি জানেন, যে কারণে মুসলমানের পতন হইল, ঠিক সেই কারণেই একদিন যে ইংরেজের পতন হইতে পারে—তাহা বৃটিশ রাজলক্ষ্মীর মারফতে তিনি বৃটিশকে স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই : "যদি বৃটিশ অপক্ষপাত ন্যায়নিষ্ঠার সহিত শাসন-পালন করে, তবেই তাহার রাজত্ব স্থায়ী হইবে, নতুবা "ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য ডুবিবে নিশ্চয়।" বৃটিশ-লক্ষ্মী ক্লাইবকে বলিতেছেন :

> "যতদিন পূর্ব্বরাজ্যে ব্রিটিশ শাসন
> থাকিবে অপক্ষপাতা বিশদ এমন
> ততদিন সেই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
> এই মহা রাজনীতি মোহান্ধ যবন
> ভুলিয়াছে। এই পাপে ঘটেছে নিরয়,
> এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন।"

বাঙালি চরিত্র সম্বন্ধে—ইহার নিগূঢ় দুর্বলতা সম্বন্ধে কবি বিশেষ ভাবেই সচেতন ছিলেন। তাই বাঙালির বীরত্বের উদ্বোধন করিয়াও কবি বাঙালি জাতির দুর্বলতা জগৎশেঠের মুখ দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন :

> "স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়
> তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত।

প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়
কার্য্যকালে দেখে সব নিজ নিজ পথ।"

কবি-কল্পিত বাঙালি চরিত্রের এই দুর্বলতা পলাশির যুদ্ধে পঞ্চম সর্গে আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। অধঃপতিত একটি জাতিকে জাগাইতে হইলে শুধু তাহার বীরত্বের মহিমা কীর্তন করিলেই হয় না, সেইসঙ্গে তাহার চরিত্রের দুর্বলতাকেও আঘাত করিতে হয়—কবি এই ভাবটি বিশেষভাবে বায়রন হইতে আয়ত্ত করিয়াছেন—তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ 'The Isles of Greece' শীর্ষক কবিতাটি হইতে।

'পলাশীর যুদ্ধ'কে আমরা ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি গীতিকাব্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। কবি ইহা মহাকাব্য বা খণ্ডকাব্যের আকারে সর্গবদ্ধ ভাবে রচনা করিয়াছেন বলিয়া সকলেই ইহাকে কাব্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তখনই বলিয়াছিলেন, "পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প। গীতিই প্রবল।" খণ্ডকাব্য হিসাবে তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন—গীতি এত প্রবল না হইয়া উপাখ্যান ও নাটকের ভাগ বেশি থাকিলে ভাল হইত। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন: "এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্য্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য্য অতি অল্প। যাহা আছে তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গ সকল পরিপূরিত হইয়াছে।" উপাখ্যান ভাগের ক্ষীণতা এবং ঘটনার স্বল্পতাই 'পলাশির যুদ্ধ'কে কাব্যের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। উপাখ্যান নাই বলিয়া চরিত্র সৃষ্টিও ব্যাহত হইয়াছে। চরিত্র নাই, তাই রসের বৈচিত্র্য ও প্রভাবতাও নাই। এতএব অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত কাব্য না হইয়া ইহা গীতিকবিতার সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং গীতিকাব্য হিসাবে 'পলাশির যুদ্ধ' যে নবীনচন্দ্রের সার্থক রচনা, ইহার অন্তর্নিহিত গীতিমাধুর্যই তাহার প্রমাণ।

আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, 'পলাশির যুদ্ধে' কাব্যের সবচেয়ে

ত্রুটি ইহার আখ্যানভাগের পক্ষপাতিত্ব। নবীনচন্দ্র ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠক তো ছিলেনই না, মেকলে, মার্শম্যান প্রভৃতি ইংরেজ লেখকদের ইতিহাসকেই তিনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পুস্তক হইতে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সিরাজ-বিদ্বেষের মূল কারণ ইহাই। এই প্রসঙ্গে কবি কালিদাস রায় বলেন; "কাব্যের স্বকীয় প্রয়োজনেও তাঁহাকে সিরাজচরিত্র কলঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে। মুসলমানের রাজ্যধ্বংসকে কবি বিধাতার দণ্ডবিধান বলিয়াই মনে করিয়াছেন। সামান্য কয়জন বণিক যে সিরাজের বিশাল বাহিনীকে ছলে বলে পরাজিত করিল, ইহার মধ্যে গূঢ় অভিপ্রায়ই নিহিত রহিয়াছে। ক্লাইবকে নবীনচন্দ্র বিধাতৃ-প্রেরিত বিজেতা বলিয়াই শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীও বিধাতৃপ্রেরিত।" এইখানে আমরা বলিব যে কবি, অন্ততঃ ইতিহাসের গতি কিছুটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি নবাগত ইংরেজকে এইভাবে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ষড়যন্ত্রের দুর্যোগ রজনীর বর্ণনাচ্ছলে কবি বলিয়াছেন;

"অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল
শুনিছে কি মেঘমন্দ্র ঘন গরজিয়া,
বিজ্ঞাপিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর
কাঁপাইয়া অত্যাচারী পাপীর অন্তর।"

পলাশির শিবিরে নিদ্রাভঙ্গের পর:

"সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।"

বিধাতার অভিপ্রায়েই যখন এই দণ্ড, তখন পাপকে প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া দেখানোই নবীনচন্দ্রের কবিধর্ম হইয়া উঠিল। আমরা বলিব, প্রায়শ্চিত্তটা সম্পূর্ণ ইতিহাসসঙ্গত। সেই উপযোগী পাপের

সমাবেশের জন্য কবিকে কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভের মুখ দিয়া কবি তাই বলিয়াছেন :

> "ক্রমে পাপলিপ্সা-স্রোত হতেছে বিস্তার
> এই দুর্নিবার নদী, কে বলিতে পারে,
> কোথা হবে পরিণত ? কিছুদিন আর
> সতীত্ব-রতন এ বঙ্গের ভাণ্ডারে
> থাকিবেনা ; থাকিবেনা কুলশীলমান
> বঙ্গবাসীদের হায় ! এখনো সবার
> অনিশ্চিত ভয়ে ত্রাসে কণ্ঠাগত প্রাণ
> সীমা হতে সীমান্তরে এই বাঙ্গালার,
> উঠিতেছে হাহাকার, ভাবে প্রজাগণ
> কেমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন।"

হিন্দু-প্রীতি বশতঃই হউক অথবা তাঁহার অজ্ঞতার জন্যই হউক, কবি যে সিরাজদ্দৌলার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন, তাহা না বলিলেও চলে। যদি ধরিয়া লই যে, নবীনচন্দ্র ইতিহাসের গতিপথে প্রত্যাসন্ন এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলেও হতভাগ্য নবাব তাঁহার কবি-কল্পনার নিকট এতখানি অবিচার আশা করে নাই। একমাত্র এই সংকীর্ণতাদোষ মুক্ত হইতে পারিলে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যলোকে নিঃসন্দেহে আরও মর্যাদার আসন পাইতে পারিত। সিরাজের কল্পিত অপরাধকে কবি একেবারে জাতীয় অভিযোগ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারে এই জাতীয় পক্ষপাত, কোনো একটি বিশেষ চরিত্রকে যথেচ্ছ কলঙ্কিত করিয়া চিত্রিত করা, কবির পক্ষে যে আদৌ সমীচীন হয় নাই, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। বরং সিরাজকে যদি তিনি তাঁহার কাব্যের নায়করূপে দাঁড় করাইতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার কাব্যরচনা সার্থক হইত। কিন্তু প্রচণ্ড মুসলমান-বিদ্বেষ লইয়া তাঁহার পশ্চাতে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়া, সদ্যজাগ্রত বাঙালি-হিন্দুত্বের

প্রাধান্যের যে পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্রের ভাবধারা একান্তভাবেই সে পরিমণ্ডলের মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিল। তাই 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রকৃত ঐতিহাসিক আবেদন কবির কল্পনাকে যতখানি না উদ্বুদ্ধ করুক, তাহার চেয়ে বেশী করিয়াছে কবির এই রকম বিদ্বেষজনিত চিন্তার সংকীর্ণতা।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে, চক্রান্তকারীদের প্রত্যেকেরই যেন হতভাগ্য নবাবের প্রতি ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল—তাঁহার সেই অভিযোগকে জাতীয় অভিযোগ বলিয়া প্রচার করিতেছেন এবং অতিরঞ্জনের সাহায্য লইতেছেন। কিন্তু কবি নিজের জবানিতেও বহুস্থলে সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া স্বপ্ন ও আত্মধিক্কারের অবতারণা করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া সিরাজ-চরিত্রকে কুৎসিত করিয়া আঁকিয়া কবি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, নবাবের অপরাধ গুরুতর এবং সে দণ্ডযোগ্য। কবি সিরাজকে শুধু ইন্দ্রিয়াসক্ত কামপশুরূপে চিত্রিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—সমস্ত রকম পাপ ও দুর্বলতা তাহার স্কন্ধে আরোপ করিয়াছেন। নবাব শুধু পাপিষ্ঠ নহেন, তিনি কাপুরুষ, রণভীরু, দুর্বলচিত্ত, স্বার্থপর ও নির্বোধ। ... বাহুল্য, মানস-বৈদগ্ধ্যের অভাবেই নবীনচন্দ্র এই রকম অকাব্যোচিত কার্য করিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়াও কবির-যবন-বিদ্বেষ যেন তৃপ্তি লাভ করে নাই। কেন, তাহা বলিতেছি।

সিরাজকে যখন ঘাতক হত্যা করিতে আসিতেছে, কারাকক্ষে বন্দী হতভাগ্য সিরাজ তখন অনুতপ্ত হইয়া শুধু বাঁচিবার অধিকারটুকু চাহিতেছেন। যতই দুর্বৃত্ত হউন, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ইংরেজ-বিদ্বেষী নবাব আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র ঘাতকের হাতে যূপবদ্ধ ছাগের মত নিহত হইতে চলিয়াছেন—তখনও নবীনচন্দ্রের কবিজনোচিত সহানুভূতি তিনি পাইতেছেন না। বরং ঘাতকের প্রতিই যেন তাঁহার সহানুভূতি ও

সহযোগিতা প্রকাশ পাইয়াছে। 'পলাশির যুদ্ধে'র সমস্ত ঐতিহাসিক গৌরব এখানে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে কাব্যেরও। এমন একটি সুন্দর, চিত্তশালী নাটকীয় পরিবেশ—যেখানে 'পলাশির যুদ্ধে' চরম কবিত্বপ্রকাশের অবকাশ ছিল—নবীনচন্দ্রের কল্পনায় সার্থক পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। কবি সিরাজের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা ফলাও করিয়া বলিলেন, কিন্তু নবাবের ইংরেজ বিদ্বেষের কথা একবারও উল্লেখ করিলেন না—ইহা অপেক্ষা তাঁহার কল্পনা-দৈন্য আর কি হইতে পারে?

কবি বলিতেছেন:

> "হতভাগ্য! দুরাচার যুবক দুর্জ্জন
> পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল,
> কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ রোপন
> ফলিবে তেমন তরু অনুরূপ ফল।
> আজন্ম ইন্দ্রিয়-সুখ পাপ কামনায়
> কি পাপে না বঙ্গভূমি করেছ দূষিত?"

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিবার আছে। কবির বিশ্বাস ছিল সিরাজের বয়স উনিশ বৎসর মাত্র। আশ্চর্যের বিষয়, এই উনিশ বৎসরের অপরিণত যুবক কত পাপ করিতে পারে, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না — বিধাতার বিধানের সমর্থনের জন্য তাঁহার এইরূপ সিরাজচরিত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কাব্যের রীতিগত প্রয়োজন সাধন করিতেও নবীনচন্দ্রের কবিধর্মের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। মধুসূদনের অনুগামী কবির নিকট আমরা ইহা আদৌ আশা করি না।

পরবর্তীকালের ইতিহাসের নবলব্ধ তথ্যের আলোকে আমরা জানিতে পারি যে, সিরাজ ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না, তাঁহার প্রধান দোষ ছিল ইংরেজ-বিদ্বেষ। তাঁহার অত্যাচারে "সতীত্ব রতন বঙ্গের ভাণ্ডারে থাকিবে না" একথার কোনো মূল্য নাই। "বঙ্গবাসী কেমনে রাখিবে ধন রাখিবে জীবন" একথাও সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। ধন মান সেই সময় বিপন্ন

হইয়াছিল বর্গির উপদ্রবে—হিন্দুরই উপদ্রবে। সিরাজের রাজত্বে ধন প্রাণ নিরুপদ্রবেই ছিল। আজ আমরা এইসব কথা জানিবার পর 'পলাশির যুদ্ধের' কবিত্বরস উপভোগ করিতে গিয়া পদে পদে আঘাত পাই। নবীনচন্দ্র যে এসব কথা একেবারেই জানিতেন না তাহা মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার কাব্যের আদর্শ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল—একটি শয়তান, একটি কিং জন, একটি রিচার্ড। তাই তাঁহার কবি-কল্পনার অনেকখানি নিঃশেষিত হইয়াছে সিরাজচরিত্রের কলঙ্কলেপনে কলঙ্ক-কীর্তনে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, কাব্যের জন্য আখ্যায়িকা নির্বাচনে কবি বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি তলাইয়া বুঝিবার মতন। পলাশির মাঠে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধই হয় নাই—কয়েকটা গোলাগুলি লইয়া যুদ্ধের অভিনয়মাত্র হইয়াছিল—বড় জোর, ইহাকে একটি দাঙ্গা বলা যাইতে পারে। কবি ইহাকে একটা বড় যুদ্ধের মর্যাদা দিয়া খুব ঘটা করিয়া ইহার বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা আদৌ ঘটে নাই, তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। কল্পনাকুশল কবি 'আম্রবন কাঁপাইয়া,' "গঙ্গাজল কাঁপাইয়া" বৃটিশের রণবাদ্য ঘোষণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাজিয়াছিল তো কয়েকটি 'ড্রম'— তাহাতে রণস্থলের পরিবেশ সূচিত হয় কেমন করিয়া? বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এই ক্ষীণ আখ্যায়িকা কাব্যের উপাদান হিসাবে যথেষ্ট তো নহেই, এমন কি উপযোগী কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বরং তুলনায় ১৮৫৭ সালের সিপাহীযুদ্ধের উপাখ্যান কাব্যের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

নবীনচন্দ্রের রচনার প্রধান দোষ আবেগ-উচ্ছ্বাসে অসংযম। এই জাতীয় কবিতায় আবেগ বা উচ্ছ্বাসের স্থান আছে, কিন্তু সেই আবেগ বা উচ্ছ্বাসকে কাব্যধর্মী হইয়া উঠিতে হইলে কবির পক্ষে যে সংযমের প্রয়োজন, দুঃখের বিষয়, নবীনচন্দ্রে তাহার একান্ত অভাব। কাব্য-শৈলী

বলিতে যাহা বুঝায়, ‘পলাশির যুদ্ধে’ তাহা আমরা কোথায়ও দেখিতে পাই না। এই অসংযমের জন্য বহুস্থানে আতিশয্য ও অতিভাষণ দোষও ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সর্গের মন্ত্রণাসভার আলাপ-আলোচনাকেও আতিশয্য-দোষদুষ্ট বলিয়াছেন—“এই সভার কার্য আরও সংক্ষেপে সমাপ্ত হইতে পারিত। তাহাতে সর্গটি পুনরুক্তিদোষ হইতে মুক্ত হইত।” (এই কাব্যের পুনরুক্তি অত্যন্ত ক্লান্তিকর এবং এই কারণে ইহার ভাব-সুষমা বহুলাংশেই ব্যাহত হইয়াছে)। দ্বিতীয় সর্গে কবি যে আশা-প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, তাহাও আতিশয্যদোষে-দুষ্ট হইয়াছে। ইহার কতক অংশ হতভাগ্য সিরাজের কারাকক্ষে প্রেরণ করিলে ভাল হইত। এই প্রশস্তি-রচনাতেও সংযমের অভাব দেখিতে পাই।

কাব্যে দৈববাণীর অবকাশ আছে। মাইকেলের “মেঘনাদবধ কাব্যে” দৈববাণী সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর। কিন্তু নবীনচন্দ্রের ‘পলাশির যুদ্ধে’ দৈববাণীর কোনো অবকাশই নাই। তথাপি কবি বৃটিশ রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছেন তাহা দৈববাণীর পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু কী দীর্ঘ তাঁহার মুখের উক্তি—দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। কবি পলাশির শিবিরে লালসা বিলাসের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাও আতিশয্যদোষে দুষ্ট এবং সেই কারণে সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই। শিবিরের এই চিত্র বায়রনের ‘Night Before Waterloo’ কবিতার অনুকরণে অঙ্কিত বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ওয়াটারলুর যুদ্ধের পট-ভূমিকায় যাহা শোভন ও সঙ্গত হইয়াছে, পলাশির সামান্য দাঙ্গার পটভূমিকায় তাহা মানাইবে কেন? নতুবা এইরূপ চিত্র আঁকিবার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে?

তাহার পর মোহনলালের দার্শনিকতাপূর্ণ বক্তৃতা। রণভঙ্গে পলাতক সৈন্যদের উদ্দেশে মোহনলালের বক্তৃতা রঙ্গলালের পদ্মিনী-কাব্যের অনুকরণে রচিত। কবি এক্ষেত্রেও মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না। এই বক্তৃতা সুদীর্ঘ ও জ্বালাময়ী, কিন্তু এখানেও সেই পুনরুক্তি-দোষ

ঘটিয়াছে। ইহা না ঘটিলে, এই আবেদন আরও জ্বলন্ত, জীবন্ত হইতে পারিত এবং কাব্যের নায়ককে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে পারিত। এমন কি, কাব্যের এই উৎকৃষ্ট অংশটির ছন্দ-নির্বাচনে নবীনচন্দ্র নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। যে-ছন্দে কবি বক্তৃতা রচনা করিয়াছেন, তাহা উদ্দীপনা প্রকাশের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক সমালোচক তাই বলিয়াছেন ; "সবচেয়ে আতিশয্য ও অতিভাষণ দোষ ঘটিয়াছে অস্তগামী সূর্যের উদ্দেশে মৃত্যুশয্যায় বীর মোহনলালের বাগ্মীতায়। কবি তাঁহার সমস্ত উচ্ছ্বসিত বক্তব্যই মোহনলালের মুখেই বসাইয়াছেন। বীরপুরুষেরা সাধারণতঃ মিতভাষী হ'ন—বিশেষতঃ মৃত্যু-শয্যায় এত বড় সুচিন্তিত বক্তৃতা কাব্যের নাটকীয় ধর্মের বিরোধী। এমন অনেক কথা মোহনলালের মুখে কবি বসাইয়াছেন যাহা প্রভুভক্ত মোহন-লালের বলিবার কথা নয়। যে প্রভুভক্ত বেতনভুক মোহনলাল নবাবের পক্ষে অকপটভাবে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে—তাহার একটা নিজস্ব নৈতিক আদর্শ আছে। তাহার চরিত্রে ভাব-দ্বন্দ্ব ও পরস্পর বিরোধী আদর্শের আরোপ না করিলেই বোধ হয় ভালো হইত।"

তাহা ছাড়া, মোহনলালের বক্তৃতার মধ্যে সবচেয়ে বড় দোষ হইল যে 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাওয়া হইয়াছে—এক কথার ভিতর অন্য কথা আসিয়া পড়িয়াছে। পলাশির যুদ্ধে যে হারিল আর যে জিতিল—তাহাদের উভয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে কবির মিশ্র মনোভাব ছিল। কখনো ইংরাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ আবার কখনো বা ঠিক ইহার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া কবি তাঁহার দোদুল্যমান চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। মুসলমানকে পরাজিত করিয়াছে এই কারণে ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা আর হিন্দুর ভবিষ্যৎ চিরকালের মত অন্ধকার হইয়া গেল—এইজন্য ইংরেজের উপর বিদ্বেষ—ইহা হাস্যকর নয় কি ? আবার দেখিতে পাই যে কবি ইংরেজের কাছে ন্যায় বিচারেরও প্রত্যাশা করিতেছেন। কোনো প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষে ইহা করা আদৌ সম্ভব হইত না।

নবাবের প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে, পক্ষান্তরে নবাবকে যাহারা সিংহাসন হইতে সরাইতে চায় তাহাদের প্রতিও তিনি প্রসন্ন নহেন। এই সকলের ফলে কবির মনে যে মিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই মোহন-লালের বক্তৃতায় মাঝে মাঝে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। মনীষী কালীপ্রসন্ন ঘোষ কবির এই অসতর্কতাকেই লক্ষ্য কারয়া বলিয়াছেন: "এক গীতের মধ্যে আর এক গীত, এক রাগিণীর মধ্যে আর এক রাগিণী।" এবং আমাদের মনে হয়, এই অসতর্কতার জন্যই কবি যে উচ্চগ্রামে প্রত্যেক সর্গটির সূত্রপাত করিয়াছেন—সে উচ্চগ্রাম সমগ্র সর্গে রাখিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, নবীনচন্দ্রের কবিত্ব ছিল, কিন্তু কাব্য রচনা করিবার উপযোগী চিৎপ্রকর্ষ ছিল না এবং মনের আবেগ সংযত রাখিয়া তাহাকে যথাস্থলে প্রকাশ করিবার মত ধৈর্যও তাঁহার ছিল না। যখনই আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তখনই অগ্র-পশ্চাতে না চাহিয়া, রসের পারম্পর্য উপেক্ষা করিয়া কবি তাহার অভিব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া আবার আখ্যানসূত্র লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

উপাখ্যানাংশ ও ঘটনা সমাবেশের প্রতি কবির উপেক্ষার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দোষ ধরিয়াছেন। গীতিকাব্য হইলেও এই ত্রুটিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কাব্য রচনায় ঘটনা বিন্যাসে যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, নবীনচন্দ্রে তাহার একান্ত অভাব। তিনি যদি এইদিকে আরও একটু দৃষ্টি দিতেন অর্থাৎ ঘটনার সমাবেশ বাড়াইতে পারিতেন, তাহা হইলে কবি অনেক কথা যাহা যথাস্থলে বলিতে পারেন নাই, তাহা বলিবার যথাযোগ্য সুযোগ পাইতেন। ঘটনাগুলিকে তিনি দুই-চারিটি কথাতেই শেষ করিয়াছেন। "নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ"—এই একটি বাক্যের অন্তরালে একটি ঘটনা আছে। কবি রণক্ষেত্রে সিরাজ-মিরজাফরের সাক্ষাতের এমন একটি নাটকীয় ঘটনাকে ঐ এক কথায় শেষ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে কাব্যের সৌন্দর্যকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:

"প্রজার বিরাগ, পরে পলাশি সমর
পরাজয়, পলায়ন, ধৃত, কারাগার।"

এই দুই লাইনে পলাশিপ্রান্তর হইতে সিরাজের কারাকক্ষ বাসের শোচনীয় অবস্থা পর্যন্ত নিতান্তই আভাসে-ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে। পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজ ও মিরজাফরের কথা ফলাও করিয়া না বলিলেও চলিত। কিন্তু সিরাজ-লুৎফউন্নিসার কথাই ছিল এখানে কাব্যরস-সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল। কবি এই রকম বহু নাটকীয় ঘটনার সমাবেশে 'পলাশির যুদ্ধ'কে প্রকৃত কাব্যের মর্যাদা দিতে পারিতেন এবং রচনা হিসাবেও ইহা সার্থক হইত। কিন্তু নাটকীয় অবস্থা বোধের অভাবেই (Lack of dramatic sense) কবি তাহা পারেন নাই।

এইবার আমরা 'পলাশির যুদ্ধের' ছন্দ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। কবি অন্য পুস্তকে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করিয়াছেন। বাংলার কবিদের মধ্যে কেহ যদি মাইকেলের ছন্দের কিছু মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন তবে তিনি নবীনচন্দ্র। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যখানি যদি অমিত্রাক্ষরে লিখিতেন, তাহা হইলে কবি তাঁহার কল্পনার আবেগ ও উচ্ছ্বাসের রাশ টানিয়া ধরিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এই কাব্য-রচনায় বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড-এর মত স্পেনসোরিয়ান স্তবক বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে রচনার প্রবাহ প্রতি পদে বাধা পাইয়াছে—কোথায়ও সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। মিল দেওয়ার প্রয়োজন হওয়ার কবির আবেগও ব্যাহত হইয়াছে এবং ভাষা অনেক স্থলে দুর্বল, বিকৃত ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ হইয়াছে। সাধারণতঃ মিলের স্থলেই ভাষার দোষ ঘটিয়াছে—নৃশংসকে নৃশংসয়, পরাধীনাকে পরাধীনী, চন্দ্রমাকে চন্দ্রিমা, পূর্ণকে পূরিত করিতে হইয়াছে, এমন কি ন ও ম-এ মিল দিতে হইয়াছে।

"কেবল বায়রনের-নয়, 'পলাশির যুদ্ধে' অন্যান্য য়ুরোপীয় কবিদের রীতিভঙ্গীরও ছায়াপাত দেখা যায়। কবি সে সমস্তকেই সুস্থভাবে

আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছেন। চক্রান্ত-সভার চক্রীদের বক্তৃতায় মিলটনকে, সামরিক শৌর্যের অভিব্যক্তিতে স্কটকে কোন কোন স্তবকের শেষে উপনিবদ্ধ অর্থান্তরন্যাস, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি অলঙ্কারের পংক্তিগুলিতে পোপকে, আশা-প্রশস্তিতে ক্যামবেলকে, সিরাজের স্বপ্নচিত্রে সেকস্‌পীয়রকে এবং একাধিক স্থলে বায়রনকে মনে পড়ে। নবীনচন্দ্র অনেক স্থলে মাইকেলের বাচনভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। ছত্র হইতে ছত্রান্তরে ভাবধারার প্রবাহ মাইকেলেরই অনুস্মৃতি।"

পরিবেশ সৃষ্টিতে নবীনচন্দ্রের দক্ষতা অসামান্য। কোনো একটি চিত্র দৃশ্য বা প্রসঙ্গের অবতারণা করিবার পূর্বে তিনি যে অন্তরঙ্গীয় ও বহিরঙ্গীয় (inner aud outer) পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার রীতি বিদেশী কাব্য হইতে গ্রহণ করিলেও, ইহাতে কবির স্বকীয় মৌলিকতা যথেষ্ট আছে। বহিরঙ্গীয় পরিবেশের মধ্যে পারিপার্শ্বিক (environment) ও প্রকৃতি (nature) দুই-ই আছে। জগৎশেঠের গৃহে ষড়যন্ত্র হইতেছে—ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়ের মুহূর্ত আসন্ন। রুদ্ধদ্বার অন্ধকার কক্ষে মন্ত্রণা চলিতেছে। ইহার উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ এইরূপ :—

"দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী
নিবিড় জলদাবৃত গগন মণ্ডল।
বিদারি আকাশতল, যেন দুষ্ট ফণী
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল।

... ...

গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দে কাঁপিছে অবনী
দ্বিগুণ ভীষণ তরা হতেছে যামিনী।"

সেই ভীষণ অন্ধকারে বিভীষিকা মূর্তি দেখা যাইতেছে :

"সমাধি করিয়া যেন বদন ব্যাদান,
নির্গত করেছে শব বিকট দশন
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ কৃপাণ।

আর শেঠের ভবনের পরিবেশ এইরূপ :

"একটি কপাট কোথা নাহি অনর্গল।
একটি প্রদীপ কোথা জ্বলে না এখন।
তিমিরে অদৃশ্য গৃহ প্রাচীর প্রাঙ্গণ।
বোধহয় ঠিক যেন বিরল নির্জ্জন।"

আর যে গৃহে চক্রীরা বসিয়া আছেন সে গৃহে :

"প্রাচীরে চিত্রিত পটে নৃমুণ্ডমালিনী
লোলজিহ্বা অট্টহাসি ভৈরব-ভামিনী।"

এই সঙ্গে মানসিক পরিবেশের বর্ণনাও পাঠক লক্ষ্য করিবেন :

"রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন।
বহে কি না বহে শ্বাস চিন্তায় বিহ্বল
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।
অনিমেষ নেত্রে কষ্টে যেন এক মনে
পড়িছে বঙ্গের ভাগ্য অঙ্কিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে কিম্বা চিন্তাসনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্ঘাটন,
বঙ্গ-ভবিষ্যৎ সিন্ধু করে সন্তরণ।"

এইভাবে কবি প্রকৃতির সহিত মানব-মনের সংযোগ . যে-সূত্র পাইয়াছেন, তাহাও বিদেশী সাহিত্যের ভাব হইবে সংগৃহীত। কল্পনাকে মাঝে মাঝে আহ্বান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে সঙ্গ প্রার্থনাও পাশ্চাত্য সাহিত্যের পদ্ধতির অনুসৃতি। নবীন চন্দ্রের বর্ণ ও তুলিকা দুইই সার্থক হইয়াছে চিত্র-অঙ্কনে। 'পলাশির যুদ্ধে' কবির অঙ্কিত চিত্রগুলি সত্যই অপূর্ব। শেঠ ভবনের মন্ত্রণাসভার চিত্র, বৃটিশ রাজলক্ষ্মীর চিত্র, ক্লাইভের ব্যক্তিত্বের চিত্র, নবাবের শিবিরে রভস চিত্র—প্রত্যেকটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ। মানসচিত্র অঙ্কনেও কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ক্লাইবের মানসচিত্র ও সিরাজের মানসচিত্র তিনি সুন্দর ভাবেই আঁকিয়াছেন—আশা-নৈরাশ্যের

উজ্জ্বল ও ম্লান বর্ণে অভিরঞ্জিত। 'পলাশির যুদ্ধে' কবির আলঙ্কারিকতাও উপেক্ষণীয় নয়, যদিও তাহা মাইকেলের অলঙ্করণেরই অনুসৃতি।

কাব্যবিচারে নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' বাংলা সাহিত্যে যে স্থানই লাভ করুক না কেন, বিষয়বস্তুর গৌরবে এবং বর্ণনার নৈপুণ্যে ইহার সহজ আবেদন পাঠকচিত্তে চিরকাল সাড়া জাগাইবে। বহু দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও, দেশপ্রেমের আলেখ্য হিসাবে, এই কাব্য যে বাঙালির অন্তরে শ্রদ্ধার স্থান পাইয়াছে, সে বিষয়ে কঠিন সমালোচকদের মধ্যেও দ্বিমত নাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন: "যে বাঙ্গালী হইয়া, বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী জন্ম বৃথা।"

(৮) পত্রালাপে 'পলাশির যুদ্ধ'

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইবার অনেক পরে—ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা' নামক ঐতিহাসিক উপাখ্যান প্রকাশিত হইবার পর, নবীনচন্দ্রের এই কাব্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়। নটগুরু গিরিশচন্দ্র ছিলেন নবীনচন্দ্রের অন্যতম গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং তাঁহার কাব্যের একজন অনুরাগী পাঠক। সেই সময় গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে এইসব বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কবি ইহা করিতে সম্মত হন নাই। এই উপলক্ষে তাঁহাদের মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহার দুইখানি এইখানে উদ্ধৃত হইল। কবিকে চিনিতে পারা যায় তাঁহার রচনায়; বিশেষ করিয়া কবির পত্রে কবির সত্যকার জীবনটি যে ভাবে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কবির কাব্যের মধ্যেও তাহা বিরল।

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক তখন অভিনীত হইয়া খুব সমাদর লাভ করিয়াছে। তিনি ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্রেয়র সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস অবলম্বনেই তাঁহার নাটক লিখিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের পত্র

১১নং ইয়র্করোড, রেঙ্গুন
২৫।২।১৯০৬

ভাই গিরিশ,

কুড়ি বছর বয়সে 'পলাশির যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তুমি ষাট বছর বয়সে 'সিরাজদ্দৌলা' লিখেছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এই মাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশির যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল।······আমি নব-যুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশির যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময় সঙ্গীত মুখে আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম।······দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ। এই সুদূর প্রবাস হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অদ্ভুত জীবন যেন সুখ শান্তিতে শেষ হয়।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

গিরিশচন্দ্রের উত্তর

১৩নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা
৭।৩।১৯০৬

ভাইজী,

তোমার পত্র পেয়ে আমার, পত্রের উত্তরের আনন্দ নয়, সত্যই আনন্দ হয়েছে।······তুমি আমার 'সিরাজদ্দৌলার' প্রশংসা করেছ; আমি তোমার একটি প্রশংসা করি; তোমার 'পলাশির যুদ্ধে' সিরাজদ্দৌলার চিত্র অন্যরূপ হলেও তোমার স্বদেশ অনুরাগ ও সেই দুর্দ্দান্ত সিরাজদ্দৌলার প্রতি অসীম দয়া রাণী ভবানীর মুখে প্রকাশ পায়। আমার ধারণা, অনেক দেশানুরাগী লেখকের তুমি আদর্শ। আমার উপর তোমার

অকৃত্রিম ভালবাসা, এ আমার গুণ নয়, এ আমি সম্পূর্ণ বুঝি, তোমার মাহাত্ম্য।......আমি সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় তোমার সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু যে কটাক্ষ করেছেন, তার প্রতিবাদ লিখেছিলাম। কিন্তু কোন বন্ধু আমাকে এই বলে নিবৃত্ত করেন যে, মশায়, স্বভাব-কবির পলাশির যুদ্ধ কাব্য, আর সিরাজদ্দৌলার ওকালতী—দুটোতে বিস্তর প্রভেদ। আপনি সে সম্বন্ধে সমালোচনা করলে কাব্যের সম্মান বৃদ্ধি না করে ওকালতীর সম্মানই বেশী বাড়াবেন।'......আমার পলাশির যুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য ছিল—যা ইতিপূর্ব্বে বললেম—তোমার সিরাজের প্রতি স্নেহ ও তোমার দেশানুরাগ। শ্রীমান নিখিলনাথ রায় ও সমাজপতি আমার এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

স্নেহপ্রাপ্ত—গিরিশ

নবীনচন্দ্রের পত্র

১১নং ইয়র্ক রোড, রেঙ্গুন
২৩।৩।১৯০৬

ভাই গিরিশ,

......সুরেশের (সমাজপতির) দ্বারা অক্ষয়বাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমি কেন এরূপভাবে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি; তাহার লম্বা-চওড়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—তিনি লিখিয়াছেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য। তখন পড়িয়াছিলাম মার্শমেন। তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় আমিই প্রথম গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিলাম।......অক্ষয় বাবু তাহার পর আমাকে ক্ষমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন এবং আমার এক পত্র ছাপাইতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য লিখিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিষ-চক্ষে পড়িয়া এক

জীবনে অশেষ দুর্গতি-ভোগ করিয়াছি। এখন পত্রখানি ছাপিলে আমার দুর্গতি আরো বাড়িবে মাত্র।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

নবীনচন্দ্রের পত্র

রেঙ্গুণ, ২৭।৮।১৯০৬

ভাই গিরিশ,

সংবাদপত্রে দেখিতেছি 'মীরকাশিমের' বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে। এই বয়সে তোমার প্রতিভা যেন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমার অনুরোধ, আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্ম্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা—এই সব বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি কমিকো-ট্রাজিক নাটক লিখিয়া দেশ রক্ষা কর। বর্ত্তমান স্বদেশী অন্দোলনটা স্থায়ী করা উহার লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে যে স্বদেশ লইয়া কাঁদিয়াছি, এতদিনে শ্রীভগবান যেন তাহা শুনিয়াছেন এবং দেশের হৃদয়ে এই নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন···নীলদর্পণের মত এই একখানি বই তোমাকে অমর করিবে। তুমি ধর্ম্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ: এইবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবন ব্রত উদ্যাপন কর।···আমার এইরূপ পেড়াপিড়ির দরুণ বঙ্কিমবাবু 'আনন্দমঠ' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পরে উহার কি অমৃতফল ফলিয়াছে দেখিতেছ ত! তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

কবি নবীনচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহার লেখা চিঠির কথাগুলি যে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি নাট্যশালাকে ভালবাসিতেন এবং জাতীয় জীবনে নাট্যশালার যে একটি বিশেষ স্থান

আছে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' নাট্যাকারে অভিনয় করিয়া সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যশস্বী হইয়াছিলেন। এবং রঙ্গালয়ে নবজীবনের স্পন্দন জাগাইয়াছিলেন। তিনি সিরাজ-চরিত্রকে রূপ দিয়াছিলেন এবং সেই ভূমিকায় সিরাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের সেই মর্মস্পর্শী বাণী—"কি হয়, কি হয় রণে, জয়-পরাজয়—" দর্শক চিত্তে সেদিন নূতন আবেগের সঞ্চার করিয়াছিল। 'কুরুক্ষেত্র কাব্যকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়া মঞ্চস্থ করিবার জন্য নবীনচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে একবার অনুরোধও করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের পূর্বসূরি মধুসূদন যেমন রঙ্গভূমিকে ভালবাসিতেন, তিনিও তেমনি রঙ্গালয়কে ভালবাসিতেন। কবির পক্ষে ইহা গৌরবের কথা।

(৯) দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ

প্রথম সর্গ

নিবিড়-জলদাবৃত—ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। বিদারি আকাশতল ··বিজলি চঞ্চল—আকাশের বুক চিরিয়া চঞ্চল বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চমকাইতেছে এবং বিদ্যুতের এই চমকানি ঠিক যেন সাপের মতো দেখাইতেছে। সাপের সঙ্গে বিদ্যুতের উপমাটি সুন্দর। সুর-বালাগণ—দেব কন্যাগণ। গগন-গবাক্ষ—আকাশের জানালা। যবনের অত্যাচার···হয়ে আচ্ছাদিত—কবি এখানে সিরাজের অত্যাচারের ভীষণতা বুঝাইবার জন্য এই নৈসর্গিক দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছেন। পাছে নবাবের অত্যাচারে নক্ষত্রকুমারীদের নির্মল হৃদয় কলঙ্কিত হয়, সেই ভয়ে তাহারা ঘন মেঘের অন্তরালে তাহাদের মুখ লুকাইয়া নীরবে চিন্তা করিতেছে। যামিনী—রাত্রি। নীরদ—মেঘ। নীরদ-নির্ম্মিত নীল চন্দ্রাতপতলে—মেঘের তৈরী নীল চাঁদোয়ার তলায় অর্থাৎ আকাশের নীচে। হিল্লোল—তরঙ্গ। অস্পন্দ—স্পন্দন রহিত হইয়া

অকম্পিত ভাবে। বিজ্ঞাপিছে—জানাইতেছে। অনন্তকায়—একাকার। নীহার-নয়নজলে—তুষারের মতো ঠাণ্ডা চোখের জলে। নীহার—তুষার। তিতিছে—ভিজিছে। সমস্ত শর্ব্বরী—সারা রাত্রি। সুরপুরী-সম—স্বর্গের সমান। শেঠের ভবনে—জগৎশেঠের বাড়ীতে। সুতার—সুমিষ্ট স্বর-বিশিষ্ট। অভীষ্টিত—সংকল্পকৃত। ন্যস্ত—অর্পিত। মজিয়া—মগ্ন হইয়া। চিত্ত সনে—চিত্তের সঙ্গে। ক্রোধ-গরিমা-গরল—ভীষণ ক্রোধ। বিষাদিত—বিষাদে আচ্ছন্ন। সৈরিন্ধ্রী-স্বরূপা···কীচক-যবন ?—যে নারী পরগৃহে শিল্পাদি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। [মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডব যখন দ্রৌপদীসহ বিরাটরাজগৃহে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা প্রত্যেকেই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন এবং দ্রৌপদী সেই সময় সৈরিন্ধ্রীনাম লইয়াছিলেন। কীচক দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অপমান করে। কবি এখানে যবনকে কীচকের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশকে সৈরিন্ধ্রীরূপে কল্পনা করিয়াছেন।] কৃষ্ণা—দ্রৌপদী। কৃতঘ্নতা-অসি······আহা !—ধর্ম বিসর্জন দিয়া কেমন করিয়া কৃতঘ্নতারূপ তরবারী হাতে ধরিব অর্থাৎ কেমন করিয়া কৃতঘ্ন হইব ? যেই করে—যে হাতে। অভিসন্ধি—উদ্দেশ্য। স্বর্গ মর্ত্ত্য······নিজ পথ—এইখানে কবি বাঙালি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরস্পর স্থান বদল করে তথাপি বাঙালির মধ্যে ঐক্যস্থাপন অসম্ভব। অর্থাৎ অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বাঙালি কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিবে না। বাঙালি প্রতিজ্ঞা করিতে খুব পটু, তাহাদের সাহসও আছে, কিন্তু ঠিক কাজের সময়ে প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথ দেখে অর্থাৎ বচন-সর্বস্ব বাঙালি কাজের বেলায় কিছুই নয়। অপার—অনেক। দায়—দায়িত্ব। লৌকিক রোদন—লোক দেখানো ক্রন্দন। রাষ্ট্র—প্রচারিত। জগৎশেঠের নাম···সমকক্ষ—জগৎশেঠের কথার দাম একলক্ষ টাকার সমান। আপনি নবাব······যাহার দুয়ারে—অন্য লোকের কথায় দরকার নাই, স্বয়ং নবাব জগৎশেঠের নিকট টাকা কর্জ করিয়াছিলেন।

সম্ভব, হইবে···শেঠের গরিমা—শরৎকালের আকাশে চাঁদ লুপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ ইহা সম্ভব, কিন্তু শেঠের গৌরব বিলুপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দাবানল—বনাগ্নি। সুবিস্তার—সুবিস্তৃত। দশন-দংশনে—দাঁতের কামড়ে। নিদাঘে—গ্রীষ্মকালে। এ ভুজঙ্গ—অর্থাৎ নবাব সিরাজদ্দৌলা। নিমীলিত নেত্রে—চোখ বুঁজিয়া। চিন্ত—চিন্তা কর। ব্যাধবন-নিপীড়ন—ব্যাধকর্তৃক নিপীড়িত বন। পরন্তপ—শত্রুকে যে নিগ্রহ করে। সেনকুল-কুলাঙ্গার—রাজা লক্ষ্মণ সেন। জেতৃভেদে—বিভিন্ন বিজয়ী হিসাবে। বিধি—ভগবান। তেয়াগিল—ত্যাগ করিল। পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার—পূর্ণিয়ার অপদার্থ নবাব শওকত জঙ্গ। ইনি নবাব আলিবর্দির দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইনিও বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদারীপদের বাদশাহী সনন্দ পাইয়াছিলেন এবং সিরাজদ্দৌলার ওম্‌রাহগণ তাঁহার স্বপক্ষে আছেন জানিয়া ইনি নবাবীর আশায় সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পূর্ণিয়ার যুদ্ধে নিহত হন। সৈন্যাধ্যক্ষে—মীরজাফরকে। হুগ্লীতে—হুগলীতে। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। ভাতিল—শোভা পাইল। অর্ব্বাচীন—নবীন। অস্পন্দ-শরীর—স্থির। কাল রঙ্গে—কালো রঙে। দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্বস্থাপন—নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিলে দাসত্বের বদলে দাসত্বই স্থাপিত হইবে—হিন্দুদিগের তাহাতে বিশেষ কোনো সুবিধাই হইবে না। নহে দূর দিল্লীর পতন—দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। জিনি—জয় করিয়া। বিষম বিকল্প স্থানে—ভীষণ সংশয়পূর্ণ জায়গায়। স্বরীশ্বর—ইন্দ্র। জীমূতবৃন্দ—মেঘদল।

দ্বিতীয় সর্গ

সহস্র কিরণ—সূর্য। জীবন—জল। শোভিছে একটি···জাহ্নবী-জীবনে—পশ্চিম আকাশে একটি সূর্য শোভা পাইতেছে, আর গঙ্গার জল-তরঙ্গে

তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া সহস্র সূর্যের মতো মনে হইতেছে। কেতন—পতাকা। তুরঙ্গ—অশ্ব। বারণ—হস্তী। বিকচ—প্রস্ফুটিত। শীকর—বায়ুচালিত জলকণা, জলবিন্দু। আনায়—জাল, ফাঁদ। শ্বেতদ্বীপ-সুত—ইংরেজ। দিনেশ—সূর্য। হায়রে পূর্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে—কবি এখানে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, আগে শৌর্যেবীর্যে শিক্ষায় সভ্যতায় ভারতবর্ষের যে গৌরব ছিল, এক্ষণে তাহা য়ুরোপে ইংলণ্ডের হইয়াছে। বর্ত্তুল—গোল। অঞ্জনা তনয়—হনুমান। রঙ্গে—রঙ্গ করে। কাদম্বিনী—মেঘ। নতুবা যে পথে···মমগতি—এখানে কবি বলিতেছেন যে তাঁহার পূর্বগামী সকল কবিই পরিচিত বিষয় বস্তু অর্থাৎ পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই রকম অপরিচিত পথে অর্থাৎ ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা লইয়া আর কেহ কাব্য রচনা করিতে প্রয়াস পান নাই। ভবিতব্যতা—অদৃষ্টলিপি। আর্দ্রিত—সিক্ত। প্রক্ষালিত—ধৌত। ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে—সমুদ্রে সামান্য ভেলা অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৌকা ভাসাইয়া আরোহী যেমন ভরসা করে, ক্লাইবও তেমনি মীরজাফরের কথায় বিশ্বাস করিয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। ফরাসি-সিংহ—পলাশির যুদ্ধের সময়েও ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে ফরাসী বণিকেরা ইংরেজ বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। দুইবার যমদণ্ড···সৈনিকের করে—ক্লাইব বাংলাদেশে আসিবার পূর্বে মাদ্রাজে দুইবার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন এবং আর্কটের যুদ্ধে বিপক্ষ সৈন্যের হস্তে তাঁহাকে আর একবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব রমণী—স্বপ্নে ক্লাইব ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীকে দেখিলেন। কুবলয়—পদ্ম। বালার্ক-প্রভাত সূর্য (অর্ক-সূর্য)। ঐরাবতী—ইরাবতী। দমি—দমন করিয়া। নিস্তারা—নক্ষত্রহীন। ঈশা—যীশুখৃষ্ট। উপজিবে—উদয় হইবে।

———

তৃতীয় সর্গ

সান্ত্রীদল—প্রহরীদল, সশস্ত্র রক্ষীদল। নিরখি—দেখিয়া। নিরখিয়া···কল্পনা—সিরাজের চারিপার্শ্বে তিলোত্তমা সদৃশ এইসব সুন্দরী রমণী দেখিয়া কে বলিবে তিলোত্তমা নিতান্তই কবির কল্পনা। শ্রবণ—কান। কামে পুনঃ···কটাক্ষ চঞ্চল—মহাদেবের কোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। সুন্দরীদের চঞ্চল কটাক্ষে সেই মৃত কামদেব যেন পুনরায় জীবন লাভ করিতেছেন। ঘৃণাস্পদ—ঘৃণ্য। ধনী—রমণী, নারী। উড়ুক কামের ধ্বজা—মদনের পতাকা উড়ুক অর্থাৎ নাচে গানে প্রচণ্ড উৎসব হউক। উদাস—উদাসীনতা। বাণী-বীণা-বিনিন্দিত—সরস্বতীর বীণার সুরের অপেক্ষাও মিষ্টি। নিরেট—কঠিন (বাক্যটির প্রয়োগ এস্থলে কবিতার মাধুর্যকে হানি করিয়াছে)। দ্রবিত—বিগলিত। মৃগতৃষ্ণিকা—মরীচিকা, অলীক। হরি—হরণ করিয়া, নাশ করিয়া। জলধি—সমুদ্র। উচাটন—ব্যাকুল। খঞ্জনী—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। মহীরুহ—বৃক্ষ। ভীম প্রভঞ্জন—প্রচণ্ড বাতাস। কানাতে—শিবিরের তাঁবুর দেওয়ালে। স্বনিয়া—শব্দ করিয়া। বঙ্কিমরজতরেখা—বাঁকাচাঁদ। শর্ব্বরী-রমণ—চন্দ্র। নিশিথিনী-নাথ—চন্দ্র। ভয়,···পলাশি—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হইয়া ভীষ্মদেব যেমন শরশয্যার উপরে কিছুকাল জীবিত ছিলেন, তেমনি এই পলাশিপ্রান্তরে মানুষের সুখ-সম্ভোগের ইচ্ছাকে নিহত করিয়া ভীষ্ম শরশয্যা রচনা করিয়াছে—অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বদিন রাত্রে শিবিরে সকলেই বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছিল। বিলম্বিত—এলায়িত। ভুজবল্লী—হস্ত। তিতি—ভিজিয়া। লেখনী ছাড়িয়া—কলম ছাড়িয়া। ক্লাইব ও ক্লাইবের সৈন্যদলের অনেকেই যুদ্ধের পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী ছিলেন। যুঝিব—যুদ্ধ করিব। স্বাধীনত্ব—স্বাধীনতা। (অশুদ্ধ প্রয়োগ)। স্বগত—আত্মগত, মনে মনে, যাহা কোনও ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য না করিয়া আপন মনে বলা হয়। গোলকণ্ডার হীরকের হার—

গোলকুণ্ডার হীরার খনি প্রসিদ্ধ। সেইখানকার হীরার তৈরী হার। তারাময়—নক্ষত্রে ভরা। লয়—সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ

বিভাবরী—রাত্রি। কররাশি—কিরণমালা। সিরাজ স্বপ্নান্তে···রক্তিম নয়ন—পূর্বরাত্রিতে শিবিরে সিরাজ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হইল। প্রভাতের রক্তবর্ণ সূর্য দেখিয়া তাঁহার মনে হইল ইহা বুঝি বিধাতারই ক্রুদ্ধ-আরক্ত মুখ। তবে—এখন। রণপ্রতীক্ষায় ···প্রকৃতি যেমন—প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন শান্ত ভাব ধারণ করে, তেমনি পলাশির মাঠে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে গাছপালা পশুপক্ষী গঙ্গার জল সব স্থির, অচঞ্চল ও নীরব ছিল। দ্বিজ—ব্রাহ্মণ। নিরখিল—দেখিল। অংস—স্কন্ধ। উগরিল—উদ্‌গিরণ করিল। কামিনী-কক্ষ কলসী—মেয়েদের কাঁখের জলভরা কলসী। কুলায়—নীড়ে। ছুটে রড়ে—উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়। ব্যাজ—বিলম্ব, দেরী। রণ-পয়োধি—সমর-তরঙ্গ। কহিনূর—কোহিনূর হীরক। মসী—কালী। বীরত্ব-প্রভাকরে—বীরত্বরূপ সূর্যকে। অর্পি—অর্পণ করিয়া। রাহুকরে—দাসত্বরূপ রাহুর হাতে। নির্ঘাত—পরস্পর আঘাতজনিত শব্দ। শিখর বাহি—পর্বতের চূড়া হইতে যাহা প্রবাহিত হয়। সঙ্গিন-ঘায়—বন্দুকের সঙ্গিনের আঘাতে। বিষাদ-রজনী—দুঃখের রাত্রি। বৈজয়ন্ত ধাম—স্বর্গ। আকাশ-কুসুম······তেমন—এদেশের লোকের নিকট আকাশকুসুম কিম্বা মন্দার পর্বত যেমন কল্পনার বিষয় ছিল, ভারতবাসীর নিকট ইংলণ্ডের অস্তিত্বও এতদিন তেমনি কল্পনার বিষয় ছিল। পরিহরি—ত্যাগ করিয়া। নবীন-দৃশ্য—নূতন দৃশ্য অর্থাৎ ইংরেজের অধীনে বঙ্গদেশ। প্রসারিয়া—বিস্তৃত করিয়া। আবরিত—আচ্ছাদিত, আবৃত। পূর্ণিত হ'ত—পরিপূর্ণ হইত। ধবল জলদ—শুভ্র মেঘ অর্থাৎ ইংরেজ। নীরদ—মেঘ। করাল-কৃপাণ-মুখে

ধর্মের বিস্তার—তরবারী হস্তে মুসলমানগণ এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিল। তুলনে—তুলনায়। শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান—অদৃষ্ট বিরূপ হইলে অল্প বিপদকে ভীষণ বিপদ বলিয়া মনে হয়। ক্রীড়াপটে—চিত্রপটে, ছবিতে। দোষি—দোষ দিই। তৃতীয় নয়ন উমার ললাটে যেন—উমার কপালে তৃতীয় নয়নের মত ভারতের কোহিনূর ইংলণ্ডের রাণীর মুকুটে শোভা পাইবে। রোমানের—রোমের। পরাধীনী—পরাধীন (অশুদ্ধ প্রয়োগ)। ঈষদে—ঈষৎ।

পঞ্চম সর্গ

ঊর্ণনাভ—মাকড়সা। জলদছায়া—মেঘের ছায়া। অশিবব্যঞ্জক—অমঙ্গলসূচক। মঞ্জু—সুন্দর। নব নবাবের—নূতন নবাবের অর্থাৎ মীরজাফরের। আভূতল—আভূমি, মাটি পর্যন্ত। মকরন্দ—ফুলের মধু। অনূঢ়া—অবিবাহিতা। সমীপ—নিকটবর্তী। বাঁধুলি—লাল ফুল বিশেষ। তিতি—ভিজিয়া। নির্ব্বন্ধ—বিধান। নয়ন-আসারে—চোখের জলে। অশোক—শোকহীন। বিদারিত—বিদ[illegible]। কমলিনীদলনিভ—পদ্মের মত নরম। তমিস্র—অন্ধকার। জীমূত-নাদে—মেঘের শব্দে। বেলাসীমা—তটসীমা। করঙ্ক—শরীরাস্থি। উলঙ্গ-করঙ্ক—মাংসহীন দেহাস্থি। শিলাবৎ—পাথরের মতো। নিরয়—নরক। দুর্ব্বল—ক্ষীণ।